ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতির ইতিহাস

বই	**ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস**
লেখক	ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ﷺ
ভূমিকা	সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি ﷺ
ভাষান্তর	মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন
সম্পাদনা	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
নামলিপি	কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ﷺ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

'আপনি মুমিনদের জন্য মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে পাবেন ইহুদিদেরকে। অতঃপর মুশরিকদেরকে।' [সুরা মায়িদা : আয়াত : ৮২]

বিশ্বের বুকে জাতি হিসেবে ইহুদিদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও অপকর্মের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। কুরআনে কারিমে তাদের অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু কারা এই ইহুদি জাতি? কি তাদের গোড়ার ইতিহাস? কীভাবে তাওরাত লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয়, এর ওপর কি কি দুর্বিপাক নেমে আসে এবং হারিয়ে যাওয়ার পর আবার কীভাবে তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় ও অনূদিত হয়?

এসকল বিষয় আমরা কি জানি? যাদেরকে মুসলিমদের প্রধান শত্রু হিসেবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিলেন, তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি?

ফিলিস্তিন কাদের? প্রথম কারা আবাদ করেছিল এই পবিত্র ভূমি? ইহুদিরাই নাকি অন্য কেউ? ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হিজরত। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্বপরিবারে মিশর গমন। বনি ইসরাইলকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের মিশর ত্যাগ। হেক্সোস কারা? ফিরআউন কারা? ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন দল উপদল। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর ধর্মগ্রন্থ : তালমুদ, মিশনা, গিমারা।

যবিহুল্লাহ কে? ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। কুরআনের দর্পণে ইহুদি জাতি, জায়নবাদ, জায়নবাদী প্রটোকল। ইহুদিদের আদি উৎস, বাসস্থান, স্বভাব-চরিত্র, যুদ্ধ-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি...

এককথায় ইহুদিদের সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জানার একটি সমৃদ্ধ সমগ্রই—'ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস'

দুই.

মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাহিমাহুল্লাহ রচিত এ গ্রন্থ আপনাকে ইহুদিদের সাথে সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে—মসিহ আলাইহিস সালামের জীবনবৃত্তান্ত। তার দাওয়াতি কার্যক্রম। মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধারোহণের পর খ্রিষ্টানদের অবস্থা। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ তাদের উত্থান-পতনের ইতিহাস।

শিষ্যবৃন্দের তালিকা। বাইবেলে বর্ণিত বংশতালিকা কতটুকু বাস্তব?

কাকে করা হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ? ক্রুশের ঘটনায় খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিরোধপূর্ণ বক্তব্য।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থগুলোর বর্ণনার মাঝে বৈপরিত্য। খ্রিষ্টবাদের মুখোশ উন্মোচনকারী বরনাবার সুসমাচার।

খ্রিষ্টধর্ম কী বৈশ্বিক ধর্ম? তাদের ধর্মগ্রন্থই বা কি বলে?

আল-কুরআনে মসিহ আলাইহিস সালামের বর্ণনা।

খ্রিষ্টধর্মকে নতুন রূপ দেওয়া কে এই পোল? খ্রিষ্টধর্মে তার প্রভাব।

খ্রিষ্টানদের দল-উপদল। নীতিনির্ধারণী মহাসভাসমূহ।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তিন.

চারিদিকে যখন মুসলিমনিধনে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের চক্রান্তের সয়লাভ ঠিক তখনই মুসলিমদের জন্য এরকম একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ততটাই, যতটা জীবনের জন্য পানির প্রয়োজন।

এ সময় এমন একটি গ্রন্থে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহর বেশুমার শোকর আদায় করছি। ফালিল্লাহি হামদ!

পরিশেষে আনন্দের বিষয়—বইটির সারগর্ভ ভূমিকা লিখেছেন, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করুন।

অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো তার বেশ কয়েকটি পরিচয় থাকলেও এখানে কোনো পরিচয় উল্লেখ করছি না। কারণ, তার অনুবাদেই তাকে আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। কোনোভাবেই মনে হবে না এটি তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ।

নিরীক্ষণ এর কঠিক কাজটি করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন মাহদি হাসান। এতদিন তিনি অনুবাদের মাধ্যমে পাঠকের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এবার ঐতিহাসিক এসব তথ্য-উপাত্ত যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমেও পাঠকহৃদয়ে জায়গা করে নেবেন আশা করি।

সবশেষে ভাষা সম্পাদনা করে আমাদের সবাইকে ঋণী করেছেন শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। আশা করি, তার হাতের ছোঁয়ায় বইটির সৌন্দর্য পূর্ণতা পেয়েছে।

চার.

ইতিহাসের কাজ এটিই আমাদের প্রথম নয়। এর আগে আমরা ইতিহাসের বড় বড় বেশ কয়েকটি কাজ আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেগুলোর চেয়ে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ইতিহাসকেন্দ্রিক বই। বইটির অনুবাদ করা যেমন কঠিন ছিল; বিভিন্ন গ্রন্থ, ব্যক্তি, স্থান ও স্থাপনার নামের সঠিক উচ্চারণ লেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ের নিরীক্ষণ তার চেয়েও কঠিক ছিল। আমরা শতভাগ নির্ভুল করতে চেষ্টায় কোনো রূপ ত্রুটি করিনি। তথাপি যেকোনো অসংগতি বা ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর; তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা অসুন্দর তা কেবল আমাদের সীমাবদ্ধতারই ফল। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৮ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبيه الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد...

ইসলামের উষালগ্ন থেকে মুসলিমরা অন্যান্য জাতি-ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আসছেন। ওলামায়ে কেরাম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কলম ধরেছেন। রচনা করেছেন কালজয়ী বহু গ্রন্থ। এসব রচনা ও গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সামনে অন্যান্য ধর্মের ভ্রান্তি, অসৌন্দর্য ও আঁধারির ধুম্রজাল সম্পর্কে অবগত করা এবং ইসলামের যুগান্তকারী সোনালি শ্রেষ্ঠত্বগুলি তুলে ধরা। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ তাআলা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিশেষ করে আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করবে। [সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬]

এই আয়াতের আলোকে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অবগতির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কারণ, এতে করে আন্তধর্মীয় বোঝাপড়ার পথ সুগম হয় এবং হক-বাতিলের পার্থক্যরেখা সুস্পষ্ট হয়। তাই তো সে যুগের আবু বকর আল-বাকিল্লানি, ইবনে তাইমিয়া থেকে নিয়ে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি, শাহ আতাউল্লাহ বুখারি হয়ে হাল জমানার আহমদ দিদাত, জাকির নায়েকরা অমুসলিমদের সাথে বিতর্কের ধারা প্রবর্তন করেছেন এবং কেউ কেউ এ অঙ্গনে বাজিমাতও করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ .

আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলিমদের অধিক শত্রু ইহুদি ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। [সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ৮২]

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইহুদি এবং পৌত্তলিকরা মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আর খ্রিষ্টানরা সার্বিকভাবে মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী হলেও তাদের অনেকেই শত্রুতায় ইহুদি-মুশরিকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিশেষ করে ইহুদিদের প্ররোচনায় বর্তমান সময়ের খ্রিষ্টানরা জেনে না জেনে মুসলিমদের চরম বিরোধিতা করে থাকে। এককথায় ইসলামের বিরোধিতার কাতারে সকল কুফরি শক্তি একতাবদ্ধ। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

"অচিরেই জাতিসমূহ তোমাদেরকে ধ্বংসের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে পিপাসার্ত খাদ্যগ্রহণকারীরা খাবারের দস্তরখানের প্রতি উদগ্রীব হয়ে পড়ে।" একজন জিজ্ঞেস করলেন, সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এমন হবে? তিনি বললেন, "তোমরা বরং সেদিন সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন। এবং তোমাদের অন্তরে "ওয়াহন" ঢেলে দেবেন।" এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ওয়াহন কী? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়।"[১]

[১] *সুনানু আবু দাউদ*, হাদিস নং : ৪২৯৭, *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস নং : ২২৪৫০

কিয়ামতের আগে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো দাজ্জালের ফিতনা। সেই দাজ্জাল ও তার অনুসারীদের বড় অংশ হবে ইহুদি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"দাজ্জাল আসফাহানের ইহুদিদের মধ্য থেকে বের হবে। তার সাথে সত্তর হাজার ইহুদি থাকবে যাদের মাথায় মুকুট থাকবে।"[২] অপর বর্ণনায় এসেছে, "আসফাহান নগরির সত্তর হাজার তায়লাসান (এক প্রকার চাদর) পরিহিত ইহুদি দাজ্জালের অনুসারী হবে।"[৩]

শত্রুর মোকাবিলার জন্য চাই যথার্থ প্রস্তুতি। আর সেই প্রস্তুতির অন্যতম অংশ হলো শত্রু সম্পর্কে সর্বোচ্চ অবগতি। সুতরাং এদিক থেকেও অন্য ধর্মাবলম্বী সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

দুই.

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে বিশদ গবেষণা ও অধ্যয়ন অনেকটা কম বললেই চলে। সাধারণ মুসলিম তো পরের কথা, খোদ ধর্মীয় বিশিষ্ট মহলেও এই বিষয়টি অনেকটা উপেক্ষিত। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ মাদরাসাতেও এ বিষয়ে সিলেবাসভুক্ত পাঠদান হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে থিওলজি ডিপার্টমেন্টে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় খুবই অবহেলিত।

প্রথমে জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ায় আমার অ্যাকাডেমিকভাবে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়। অতঃপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভুক্ত হয়ে বিষয়টি আবার সামনে আসে। সে সময় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরবি ভাষায় যথেষ্ট বই-পুস্তক থাকলেও বাংলা ভাষায় খুব একটা নেই। মাওলানা হেমায়েত উদ্দিন, ড. ইবরাহিম খলিলসহ আরও কেউ কেউ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। কিন্তু এই গ্রন্থগুলোর কোনটিই বিস্তারিত নয়। কেননা, তারা এক মলাটেই পৃথিবীর অনেকগুলো ধর্ম কিংবা মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে এসেছেন। যদ্দরুণ আলোচনা হয়েছে একেবারেই সংক্ষিপ্ত। নির্দিষ্ট কোনো ধর্মকে প্রতিপাদ্য করে সে ধর্মের আদ্যোপান্ত আলোচনাসমৃদ্ধ বই আমার নজরে পড়েনি।

---

[২] *মুসনাদে আহমদ*, হাদিস নং : ১২৮৬৫

[৩] *মুসলিম*, হাদিস নং : ২৯৪৪

বাংলা ভাষায় প্রতিটি ধর্ম নিয়ে বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তখন থেকেই অনুভব করতে থাকি। মৌলিক না হলেও আরবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ অনুবাদ করেও এই শূন্যতা ঘোচানো সম্ভব বলে মনে হতে থাকে।

তিন.

দারুল মাআরিফ পড়াশোনাকালীনে লেখালিখি ও সাহিত্যচর্চার প্রতি মোটামুটি ঝোঁক ছিল। ইসলামি ম্যাগাজিনে লেখালিখি করা হতো। এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বেশ কিছু পুরস্কারও প্রাপ্তির ঝুলিতে জমা হয়েছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে শিক্ষকতায় আসার পর সেই চর্চায় ভাটা পড়ে। করোনার প্রাদুর্ভাবে দেশময় অনাকাঙ্ক্ষিত লকডাউন শুরু হওয়ার পর লেখালিখির সেই সুপ্ত বাসনাটি আবার জেগে উঠে। অবসরকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন জাতিয় দৈনিকে নিবন্ধ লিখতে শুরু করি। প্রকাশিত এসব নিবন্ধ দেখে রমজানের শেষের দিকে প্রিয় আরশাদ ইলিয়াস ভাইয়ের মাধ্যমে *মুহাম্মদ পাবলিকেশন* এর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অনুবাদের দায়িত্ব কাঁধে আসে। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই আমাকে অনুবাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।

পরিশেষে আরও দুজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়; **এক.** মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ। যার হাতের ছোঁয়া না পেলে হয়তো বইটি অপূর্ণ থেকে যেত। বইটির ভাষা সম্পাদনা করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন। **দুই.** মাহদি হাসান। নিরীক্ষণের কঠিন কাজটিই তিনি করেছেন। তাদের উভয়ের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

চার.

আমাদের এ গ্রন্থটি মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও সাবেক বিভাগীয় প্রধান ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. কর্তৃক আরবি ভাষায় রচিত। লেখক হিন্দুস্থানের এক সাধারণ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাপক অধ্যয়ন করে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের তাওফিক দান

করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তিনি নিজের মধ্যে অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গ্রন্থ রচনার প্রেরণা অনুভব করতে থাকেন। সেই প্রেরণার ফসল হিসেবে তিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈন ধর্ম নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিয়ে লিখিত বইটিই আমরা অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। আরবি ভাষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও যেসব কারণে আমরা এই গ্রন্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছি।

এক. বইটিতে ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাদের আদি উৎস, বাসস্থান, স্বভাব-চরিত্র, যুদ্ধ-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

দুই. বইটির শুরুতেই গত এক শতাব্দী যাবৎ বিশ্বের সবচেয়ে জটিল রাজনৈতিক সমস্যা তথা ইহুদি জাতি কর্তৃক ফিলিস্তিনকে নিজেদের ভূমি দাবি করার বিষয়টি তথ্য-উপাত্ত দ্বারা খণ্ডণ করা হয়েছে। এমনকি ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থের আলোকেই লেখক ইহুদিদের দাবির অসারতা প্রমাণ করেছেন।

তিন. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলি নদবির রহ. মতো ব্যক্তিত্ব বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি বইটির শুরুতে তিনি সারগর্ভ একটি ভূমিকাও লিখেছেন।

চার. ধর্মতত্ত্বে বইগুলোর আলোচনা সাধারণত খুব জটিল হয়ে থাকে যা সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সময় দুর্বোধ্য ঠেকে। এদিক থেকে বইটি স্বতন্ত্র। গ্রন্থটির আলোচনা মোটামুটি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমরাও অনুবাদের সময় সেই সাবলীলতা বজায় রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

পাঁচ. সমৃদ্ধ রেফারেন্স। বইটি গতানুগতিক ধারায় লিখিত হয়নি। বরং প্রতিটি দাবির পক্ষে রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের মহলে সমাদৃত ব্যক্তিবর্গ ও গবেষকগণের রচনা থেকে রেফারেন্স দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রয়োজনে মুসলিম মনীষীদেরও রেফারেন্স টেনেছেন।

পাঁচ.

বয়স ও যোগ্যতার বিবেচনায় আমার মতো একজন ব্যক্তির জন্য এমন একটি বইয়ের অনুবাদে হাত দেওয়া রীতিমতো দুঃসাহসই বলা চলে। সার্থক

অনুবাদের জন্য ভাষাগত দক্ষতার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক পড়াশোনা ও জ্ঞান থকা জরুরি। আর ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পরিভাষাগত জটিলতা তো থাকছেই। তারপরও আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে কাজে হাত দিই। অনুবাদকালীন পুরো সময়টাজুড়ে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাকে কাজটি সমাপ্ত করার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দিন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে পাঠকের যাতে বিরক্তি না আসে তাই আমরা পুরোপুরি শাব্দিক অনুবাদ এড়িয়ে গেছি। আবার মূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার ভয়ে পুরোপুরি ভাবানুবাদও করা হয়নি। এককথায়, বইটি পাঠকের জন্য সুখপাঠ্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মূল আরবি বইটির মধ্যে কিছু প্রিন্টিং মিসটেক রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মিসটেক উদ্ধৃতির মধ্যেও দেখা গেছে। তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি উদ্ধৃতিগুলো মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখার। উদাহরণস্বরূপ লেখক বিভিন্ন স্থানে ড. মরিস বুকাইলির The Bible, The Quran And Science এর আরবি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে উদ্ধৃতিটি আরবির সাথে মিলিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি নিশ্চয়তার জন্য মূল ইংরেজির সাথেও মিলিয়ে দেখেছি।

লেখক বইটিতে প্রচুর পরিমাণে বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে মূল আরবি বাইবেলের সাথে উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখেছি। অতঃপর অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বাইবেল (কেরি ভার্সন) থেকে উদ্ধৃত করেছি। মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমরা কয়েকটি স্থানে অনুচ্ছেদ নম্বরে গরমিল দেখতে পেয়েছি। এগুলোর অধিকাংশই আমার কাছে মুদ্রণজনিত ভুল বলে মনে হয়েছে। তথাপি অনুচ্ছেদ নম্বর এদিক-সেদিক হলেও মূল উদ্ধৃতি যথার্থভাবেই দেওয়া হয়েছে। এসব স্থানে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা সঠিক অনুচ্ছেদ নম্বরটি উল্লেখ করেছি যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ চাইলেই বাইবেলের সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

ছয়.

ইমাম শাফেয়ি রহ. তার *আর-রিসালাহ* নামক গ্রন্থটি আশিবার পর্যালোচনার পর তার শিষ্য মুজানিকে বললেন, "আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাব ছাড়া আর

কোনো কিতাব বিশুদ্ধ হওয়ার সুযোগ রাখেননি।"[৪] মহান ইমামের এই মন্তব্যের জের ধরে বলতে চাই, আমরাও এই অনুবাদটিকে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। তারপরেও কিছু ভুল থেকেই যেতে পারে। সচেতন পাঠকের কাছে অনুরোধ— এমন কোনো ভুল নজরে পড়লে সরাসরি আমাকে অথবা মুহাম্মদ পাবলিকেশনকে অবহিত করবেন। আপনার পর্যালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হবে এবং পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

এই কাজের যা কিছু কল্যাণকর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ভুল তা শয়তানের ধোঁকা ও আমাদেরই দুর্বলতা। আল্লাহ তাআলা ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে কাজটিকে কবুল করে নিন। আমিন!

—**মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন**
১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি.

[৪] *হাশিয়াতে ইবনে আবেদিন*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮

সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবি সর্দার ও শেষ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি বিশ্বস্ত ও উম্মি, যাকে এমন এক কিতাব দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়েছে, যে কিতাব বিকৃতিকারী ও অসাধুর কবল থেকে সুরক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিজের হাতে নিয়েছেন এবং যিনি এমন এক দ্বীনের ধারক যে দ্বীনের মৌলিকত্ব ও পরিচ্ছন্নতা সীমালঙ্ঘনকারীর বিকৃতি, বাতেলপন্থীর চক্রান্ত ও মূর্খের অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত অবস্থায় কেয়ামত অবধি নিরবিচ্ছিন্ন থাকার নিশ্চয়তা আল্লাহ নিজের দায়িত্বে রেখেছেন।

হামদ ও সালাতের পর...

পৃথিবীতে নানা জাতি, মানবগোষ্ঠী, সমাজ, সভ্যতা, দর্শন ও সংবিধান রয়েছে। সেগুলো সুদূর-সুবিস্তৃত যাত্রায় পথের বাঁকে বাঁকে যখনই কোনো দুর্বিপাক কিংবা বিশাল শক্তির মুখোমুখি হয়েছে সাথে সাথে এর স্থানকালপাত্রের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। কখনো নেতৃত্ব কিংবা সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা ব্যক্তি স্বার্থের প্রয়োজনে এর সাথে আপস করে নিয়েছে। এদের ওপর দিয়ে কখনও আবার সূক্ষ্ম চক্রান্ত এমনভাবে কুহেলিকার দেয়াল তুলেছে যার ফলে ইতিহাস গবেষকরাও এর প্রথম স্থপতি, মূল পরিকল্পনাকারী কিংবা প্রকৃত চিন্তকের হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়েছে। পরিণতিতে এমন কিছু ঘোলাটে ও তালগোলপাকানো তথ্য আমাদের হাতে পৌঁছেছে, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ কিংবা চুলচেরা বিশ্লেষণ না কোনো বিশ্বস্ত রাসায়নিক গবেষণাগারে সম্পাদন করা সম্ভব, না কোনো দক্ষ সুচারু অপারেশনের মাধ্যমে ফলাফলে পৌঁছা সহজ। এগুলোকে আমরা চিনে থাকি বহুজাতিক উপাখ্যান, সামাজিক নিয়মনীতি, দার্শনিক মতবাদের ক্রমধারা, উৎকর্ষমণ্ডিত সভ্যতা ও আত্মনির্ভর দর্শন

হিসেবে। প্রকৃত বিচারে এগুলো হচ্ছে পরিত্যক্ত প্রাচীন উপাখ্যান ও কথকতা। এগুলোর মধ্যে আবার কিছু আছে চরম পরস্পরবিরোধী, কিছু তালগোলপাকানো-এলোমেলো। এসবের পেছনে কাজ করেছে কোনো রাজনীতি, জুলুম-নীপিড়ন, বিজয় কিংবা পরাজয়।

মানববংশের ইতিহাসে, প্রসিদ্ধ সভ্যতার নথিপত্রে, প্রচলিত দর্শনে, জাতিগোত্রের চরিত্রে কিংবা জনপদের আচরণে পর্যবেক্ষক দৃষ্টি দিলেই আমাদের এই দাবির সত্যতা বেরিয়ে আসবে।

একইভাবে, সময়ের কোনো এক বিন্দুতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কিংবা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে স্বীয় বার্তা প্রচার করেছে এমন ধর্মগুলোরও এমন দশা। এগুলো না হতে পেরেছে বৈশ্বিক না হয়েছে চিরস্থায়ী আর না হতে পেরেছে সর্বশেষ আসমানি বার্তাও। এগুলোর যাত্রা কখনো হয়তো অন্যান্য সব সভ্যতা, সমাজ, সংবিধান কিংবা দর্শন থেকেও দীর্ঘতর ও ফলপ্রসূ হয়েছে। আর ফলপ্রসূ হওয়ার পেছনে কাজ করেছেন : বিশ্বাস ও অনুভূতির সাথে নিবিড় সংযুক্তি, সার্বজনীনতা, বুদ্ধিমত্তার বহুমাত্রিকতা, ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম শক্তি, মানবীয় বর্ণের পার্থক্য এড়িয়ে যেতে পারার কৌশল ইত্যাদি।

এ ছাড়াও ধর্মগুলো আয়ত্ত করতে পেরেছে— সর্বোত সমর্থন ও দৃঢ়ায়নের শক্তি, বুদ্ধি ও মননে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা, নিষ্ঠা ও চেতনা জাগ্রত করার কৌশল, বিশ্বাস ও মূলনীতির জন্যে নিষ্ঠা ও জীবন বাজি রাখার উপকরণ।

সঙ্গত কারণেই এসবের ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃহৎ সামরিক শক্তি, কার্যকর সমরাস্ত্র, জাতির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সফল কেন্দ্র, মানবগোষ্ঠীকে দিশা দেওয়ার উৎকৃষ্ট উপাদান। ফলে বিভিন্ন শাসকযন্ত্র ও বুদ্ধিজীবিরা – যারা লাভ লোকসানের নিক্তিতেই সবকিছুর বিবেচনা করে, রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামরিক শক্তির নিরিখে হিসেব কষে—এই সমীহ জাগানিয়া বিপুল শক্তিকে ব্যবহার করতে লোভাতুর হয়ে উঠে। কারণ এই শক্তির শেকড় ও স্থায়িত্ব সমেত কাজে লাগানো সহজতর। অতঃপর তারা সেই ধর্মে দীক্ষিত হয় ও আবেগতাড়িত হতে শুরু করে। এরপর শুরু হয় ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে আদানপ্রদান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কিংবা সিংহাসন ও গির্জার মধ্যেও এমনটা চলতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই প্রভাব প্রতিপত্তির দোলাচলে সঠিক সিদ্ধান্ত বের করে আনা দুরূহ হয়ে উঠে, কার উপকার হচ্ছে কার ক্ষতি হচ্ছে সেটা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হয়ে যায়। বস্তুবাদ ও

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বোঝাপড়া দরকষাকষিতে আকিদা ও প্রধান লক্ষ্য থেকে সরে যাবার কারণ ঠিক করাও মুশকিল।

অনুরূপভাবে, সেই ধর্মগুলো এর উত্তরসূরিদের চেতনা, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী ও তাদের আমানত ও বিশুদ্ধতা, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা, মৌলিকত্ব, তাদের কুরবানি এবং ধর্মকে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বিশুদ্ধতায় ধরে রাখতে তাদের সচেষ্টতার মাত্রার ওপর পুরোদমে নির্ভর করে। এভাবে ধর্মগুলি প্রভাব ফেলতে ফেলতে প্রবাহিত হয় জনপদ থেকে জনপদে, লোকালয় থেকে লোকালয়ে, কখনো সেই যাত্রা হয় জোর খাটিয়ে, কখনো দ্রবীভূত হয়ে। একেক সময় এদের সাথে দ্বন্দ্ব গড়ে উঠে প্রাচীন জাহেলিয়্যাতের, আবার কখনো নব্য আধুনিক পৌত্তলিকতার সাথে। এরই মধ্য দিয়ে এসব ধর্মের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও জীবনাচারে গভীর ছাপ পড়ে। পথের বাঁকে বাঁকে ধর্মগুলো অনেক কিছুই কুড়িয়ে নেয়, কখনো প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়, কখনোওবা পরোক্ষভাবে আন্দোলিত হয়। এরপরে আসে এসবের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার মুহূর্ত, প্রাথমিক সময়ের বার্তাবাহক ও আহ্বায়কের রেখে যাওয়া মূলের দিকে এসব বিকৃত ও সংক্রমিত ধর্মগুলোকে ফিরিয়ে আনতে শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ। যদি এদের কোনো সংরক্ষিত ইতিহাস কিংবা সুরক্ষিত জ্ঞানভান্ডার থেকে থাকে তাহলে সেই সব ধর্মের আত্মমর্যাদাশীল সংস্কারক, প্রাজ্ঞ সংশোধনকারী, প্রথম সময়ের প্রকৃষ্ট আকিদা ও মৌলিক নবুয়তি শিক্ষার অস্তিত্বের দিকে এর প্রত্যাবর্তন নির্ভর করে। কিন্তু এমন নজির ধর্ম ও জাতির ইতিহাসে বিরল, আর অন্যান্য বিষয়ের ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে এমনটা আরও বেশি বিরল।

বিভিন্ন জাতি, উম্মত, সমাজ, সভ্যতা, সংবিধান ও দর্শনের যাত্রার গল্পগুলি যারা লিখার কাজ করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক। যেমন : 'হিস্টোরি অফ দ্য ইউরোপিয়ান মোরালস' এর লেখক লেকি, 'হিন্দুস্থানের সভ্যতার ইতিহাস' ও 'আরব সভ্যতা' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক গুস্তাভ লি বোন, 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অফ দ্য রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থের লেখক গিব্বন, 'দ্যা মেকিং অফ হিউম্যানিটি' বইয়ের লেখক ব্রিফল্টসহ অসংখ্য লেখক উদাহরণ স্বরূপ এই বিষয়ের দীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন।

কিন্তু গতিশীল ধর্মের ইতিহাস, এর স্থানকালব্যাপী ভ্রমণ এবং আকিদাগত ও প্রয়োগিক যাত্রার গল্প, এর নিজের অস্থিমজ্জার সাথে ঐকান্তিক কাহিনি, বাহ্যিক খোলসের সাথে ঐতিহাসিক উপাখ্যান-এসব কিছু খুবই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, জটিল এবং ঠনঠনে। যদি শুধু প্রথম বিষয়টিই তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, এর গবেষককে হতে হবে একাধিক ভাষায় দক্ষ, বিপুল

ধর্মীয় কিতাবাদি ও যুক্তিবিদ্যার গবেষণা পাঠের জন্য চরম ধৈর্যের অধিকারী। তাই দেখা যায়, এই প্রকল্পে সময় দিতে ও গবেষণা করতে খুব কম লোকই আগ্রহী, বিশেষ করে এই যুগে খুবই অপ্রতুল যে সময়ে চিন্তার দিগন্ত প্রস্তুত, প্রাচ্য-প্রাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তুলনামূলক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত, দীর্ঘকাল যাবৎ আলোর মুখ দেখতে না পাওয়া ধর্মীয় ইতিহাসের উৎসগুলো প্রকাশ হতে উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু যেমনটা আমরা বলেছি, এর জন্যে দরকার রকমারি সাংস্কৃতিক অভিরুচি, দরাজ দিল, কঠোর অধ্যবসায় ও দৃষ্টি-আত্মার পরিশ্রম।

খুশির উপলক্ষ্য এই যে, আমার প্রিয় সম্মানিত ভাই, মদিনা মুনাওয়ারার জামেয়া ইসলামিয়ার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আযমি এই কঠিন দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধর্মীয় ইতিহাসের উৎস ও আদি মূল অন্বেষণের কষ্টসাধ্য দীর্ঘ যাত্রায় মুসাফির হয়েছেন, প্রাচীন গ্রন্থ ও ইতিহাস, ধর্মীয় দল-উপদল প্রধানদের গ্রন্থনা, ইউরোপিয়ান ধর্মীয় ঐতিহাসিক দিকপালদের লেখনীর আলোকে সেসব সুচারুভাবে উপস্থাপন করেছেন। বইয়ের এই অংশে –আমি যে অংশটির জন্যে ভূমিকা লিখছি- তিনি গবেষণা চালিয়েছেন "ইহুদি ও খ্রিষ্টান" ধর্ম, এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস, এর ওপর আপতিত রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, জাতিগত ও সভ্যতাকেন্দ্রিক সন্ধিক্ষণ নিয়ে। এবং এর প্রতিধ্বনিতে এই ধর্মদুটি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল তা নিয়ে। গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে নবীদের পিতা সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নিয়ে, এরপর তাঁর ইলমি ও উদ্ঘাটন যাত্রা পৌঁছেছে খ্রিষ্টবাদের সূচনার ইতিহাসে, এর ক্রমবিকাশ ও পরবর্তীতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা, আকিদা ও রীতিনীতির ভিন্নতার ইতিকথা, এর গর্ভে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন সংস্কারবাদী ও সমালোচনা নির্ভর তৎপরতার ইতিবৃত্ত আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির একটি বড় অংশে আলোচিত হয়েছে সেমেটিক গোত্রের রাজ্যত্যাগের প্রবাহ থেকে নিয়ে অন্যান্য মানবগোত্রের অঞ্চল নিয়ে। এ ছাড়া সায়্যিদুনা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গমনপথ ও তাঁর সময়ে মিশরের ভিত্তি স্থাপন, প্রকৃত "যবিহুল্লাহ", সায়্যিদুনা ইয়াকুব ও তার সন্তানদের মিশর অভিমুখে হিজরত, সেখানে তাদের অবস্থান ব্যাপ্তিসহ মুসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব ইত্যাদি আলোচনাও তিনি করেছেন।

এরপর দীর্ঘ পুরুস্থ আলোচনা শুধু "পুরাতন নিয়ম" (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ও নবীদের অধ্যায় নিয়ে, কীভাবে তাওরাত লিপিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হয়, এর ওপর কি কি দুর্বিপাক নেমে আসে এবং হারিয়ে যাওয়ার পর আবার

কীভাবে তা পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় ও অনূদিত হয় তা নিয়ে। এছাড়াও আছে তালমুদ ও এর শিক্ষা এবং জায়নবাদি প্রোটোকল নিয়ে আলোচনা।

এরপর তিনি উপনীত হন মসিহ আলাইহিস সালামের যুগে। লেখনীর জলটলটল গতিতে একের পর এক লিখে গেছেন—

মসিহ আলাইহিস সালামে দাওয়াতি কার্যক্রম ও উপকরণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্ত, তাঁর ওপর বাস্তবায়িত আদালতি প্রহসন নিয়ে, তার ঊর্ধ্বারোহণের পর তার অনুসারীদের কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কীভাবে মসিহ আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও পদ্ধতির মূলে নোংরা পরিবর্তন সাধিত হয়?

সায়্যিদুন ইসা মসিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আমাদের কুরআনের বক্তব্য, মসিহ পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সেন্ট পল নিয়ে আলোচনা, পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টবাদকে রোমান ও ইউনানী ছাঁচে ঢেলে সাজানো কনস্টানটাইনের আলোচনা, বাইবেলের চারটি সংস্করণ নিয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলাপ, পরিত্যক্ত বাইবেল নিয়ে আলোকপাত, বাইবেল সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বরনাবার বাইবেল নিয়ে পর্যালোচনা, এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ও পরস্পরবিরোধী নথি পরিবেশন, উপরন্তু তিনি পাঠকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন 'আরিয়ুস' ও তাঁর সংস্কারপন্থী বিপ্লবী ভূমিকার সাথেও।

এভাবে লেখক বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়কে বিন্যাস করেছেন নানা অমূল্য তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে।

প্রাচীন ধর্মসমূহের ইতিহাস, গঠন ও বিকাশ নিয়ে যে তুলনামূলক পর্যালোচনা হতে পারে, এ গ্রন্থটি তারই একটি প্রশংসাযোগ্য শুভসূচনামাত্র। গবেষণা যতই জ্ঞানগর্ভ ও আন্তরিক হোক, তাতে প্রান্ত বা চূড়ান্ত বলতে কিছু নেই। বরং গবেষণায় নিয়তই সমালোচনা ও সংযোজনের অবকাশ ও আবশ্যিকতা থেকে যায়। তবু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই নতুন সূচনাগুলোও বড়রকমের প্রেরণা জোগায়।

ফাঁকহীন ব্যস্ততা, মনোঃবিক্ষিপ্ততা ও মুহুর্মুহু বিদেশ-সফরের ভেতরেই গ্রন্থটির ওপর হালকা নজর বুলিয়ে এ অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ায় আমি উপনীত হয়েছি।

যেহেতু এই গ্রন্থের লেখক হিন্দুস্থানে –প্রাচীন ধর্ম ও গভীর দর্শনের লালনক্ষেত্র—জন্ম নেওয়া ও বেড়ে-উঠা হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমানদের

একজন, যার হৃদয়কে আল্লাহ ইসলামের জন্য সুপ্রশস্ত করেছেন, ঈমানের শিখা জ্বেলেছেন, তাঁর কাছে আমরা আশা করতেই পারি, তিনি যেন প্রাচীন হিন্দুধর্মের গবেষণার জন্যেও সময় বের করেন। আরবি ভাষায় হিন্দুধর্মের গবেষণা ও ঐতিহাসিক উৎস অপ্রতুল হওয়ায় এই ধর্মের উদ্ভব, বিকাশ ও বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচনকারী বিশাল এক তথ্যভান্ডারে পরিণত হবে। আর এ কাজের মাধ্যমে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি মিশনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন যা উনার আগেও আরেক নওমুসলিম শায়খ উবায়দুল্লাহ আল-ফা'ইলী (মৃত্যু- ১৩১০ হিজরি) তাঁর গ্রন্থ "তুহফাতুল হিন্দ" এর মাধ্যমে আঞ্জাম দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে উসিলায় আল্লাহ তাআলা অসংখ্য বান্দা ও হিন্দুস্থানের উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালী পৌত্তলিকদের হিদায়াতর আলো দান করেছেন। তাঁর মতো তারই মিতা শায়খ উবায়দুল্লাহ আস-সিন্ধিও একই ভূমিকা রেখেছিলেন। এতে করে কল্যাণের বিশাল একটা ধারা জারি হবে। আশা করি, দ্বিতীয় খণ্ডটি শুধু হিন্দুধর্ম বিষয়ে হবে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি ব্যক্ত করেছেন এই গ্রন্থের ভূমিকায়।

আল্লাহ লেখকের ইচ্ছা-আশা, স্বপ্ন ও সংকল্পকে ফলে-ফুলে সুশোভিত করুন। তিনি যাকে কল্যাণে ভরিয়ে দিতে চান, এ গ্রন্থ দ্বারা তার সমূহ উপকার সাধন করুন! জটিল-বেপথু দর্শন ও পঙ্কিল পৌত্তলিকায় ক্লেদাক্ত ভারত উপমহাদেশকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আলোকিত করে দিন! আল্লাহ যাকেই চান তাঁকে সিরাতে মুস্তাকিমের দিশা দেন।

—আবুল হাসান আলি আল-হাসানি আন-নদবি
রায়বেরেলী, হিন্দুস্থান
২৬ রবিউল আওয়াল, ১৪০৫ হিজরি
২০/১২/১৯৮৪ খ্রি.

সম্পাদকের কথা

ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বিশ্বজয়ী বার্তা নিয়ে এসেছিল যে কুরআন, সে কুরআনই বলছে—'তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর বন্ধু'। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৫১]

প্রশ্ন জাগে—তারা পরস্পর বন্ধু হলে তো তারা খুবই ভালো মানুষ। সহজ উত্তর—তাদের গুমোট আঁধারি ও ঘুটঘুটে গুমর অন্য জায়গায়। তাদের এই আপাত বন্ধুত্ব ও বন্ধন ইসলামের আলোকে এক ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার স্বার্থে। অথচ তাদের পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে একেবারে রক্তচোখ ও খড়গহস্ত। তখন পরস্পরকে নোংরাভাবে নাকচ করে এই বলে—'ইহুদিরা বলে, খ্রিষ্টানদের কোনো ভিত্তি নেই। (সব বাজে বকোয়াস)। খ্রিষ্টানরা বলে, ইহুদিদের কোনো ভিত্তি নেই (সব বাজে বকোয়াস)।' [বাকারা : ১১৩] এরকম কদর্য কাদা ছোড়াছুড়ি তাদের নিত্তনৈমত্তিক ব্যাপার।

জাতদুষ্ট এ দুটি জাতির জীবন ও ইতিহাসে যে কিছুই নেই, এমন নয়; বরং তাদের রয়েছে ঐতিহাসিক পরিচয়, প্রতিভা, বুদ্ধি, সম্পদ এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু তাদের নেই একটি পরসহনশীল পরিচ্ছন্ন হৃদয়, বিশেষ করে ইসলামকে সহ্য করার মানসিকতা।

ইসলামের বিরুদ্ধে করতে গিয়ে তারা পুরো পৃথিবীর স্বপ্নের বীজতলায় ঢেলে দিয়েছে সর্বধ্বংসী বিষ। এ জন্য তারা শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রু নয়, তারা প্রতিটি সুন্দর-সম্পন্ন-সুখী পৃথিবীরই চরম শত্রু।

সুন্দর পৃথিবী আর সুস্থ-সুখী মানবতার প্রত্যাশী প্রতিজন মানুষেরই নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা, তাদের রক্তখেকো কালো থাবা থেকে চিরমুক্তির জন্য সফল প্রকল্প হাতে নেওয়া। বহু শতাব্দী ধরে এ প্রকল্প হাতে নিয়ে পুরো পৃথিবী ও মানবতাকে ঋণী করেছেন বহু বরেণ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সেই গৌরবটা অর্জন করতে যাচ্ছে

উঠতি ও উদ্দমী প্রকাশনা 'মুহাম্মাদ পাবলিকেশন'। ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য বলেই তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের ধন্যবাদ জানাতে হয় আরও বহু গুরুত্বগভীর, গর্বিত ও সময়োপযোগী কাজের জন্য।

বাংলা ভাষায় ইহুদি-খ্রিষ্টান নিয়ে একেবারে কাজ হয়নি এমন নয়, তবে তুলনামূলক খুবই কম হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আগুরু-শেষ দেখার সুযোগ হয়েছে। যতই পড়েছি ততই এর গুরুত্বগভীরতা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে। সত্যিই বাংলা ইসলামি গবেষণা-ভান্ডারে উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন।

অনুবাদক সবেমাত্র যাত্রা শুরু করেছেন। শুভযাত্রায় তাকে সু-স্বাগত। তিনি কতটুকু যত্ন ও কষ্ট করে পাঠকদের অনুবাদটি উপহার দিচ্ছেন, সেটা তিনি তার 'কথায়' জানিয়েছেন। আমিও তা স্বীকার করি। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে ঠিক এখনই অনেক কিছু বলে তাকে আমি 'ভাসিয়ে' আর 'বসিয়ে' দিতে চাই না। বরং তাকে মৃদু 'কলমি খোঁচা' দিয়ে বলতে চাই—তাকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে, পথের বাঁক-মোড় সম্পর্কে আরও ওয়াকিব ও সচেতন হতে হবে। তাহলেই,—আমার দৃঢ় আশা—তিনি চমকে দিতে পারবেন।

সর্বোত শুকরিয়া আল্লাহর জন্য। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য রইল ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। উম্মাহর কল্যাণের জন্যই এ কর্ম কবুল করুন দয়ালু আল্লাহ!

—মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম
২০/১২/২০২০

এই বইয়ের গল্প

সকল প্রশংসা আল্লাহর, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের ওপর।

এই বইটির একটি গল্প আছে; আমার মনে হয় পাঠকের তা সংক্ষেপে জানা উচিত। আল্লাহ যখন আমাকে তাঁর বিশুদ্ধ ইসলামে জায়গা করে দিলেন, আমার এই নব নির্বাচিত ধর্ম নিয়ে হিন্দুধর্মের পণ্ডিতদের একটি দলের সাথে আমার নিয়মিত বিতর্ক ও আলোচনা চলতে থাকে। এ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের সাথেও ইসলামের তুলনা চলত। সেই তর্ক-বিতর্ক কিংবা আলোচনার মাধ্যমে তাদের জোর প্রচেষ্টা ছিল, আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করা। কিন্তু মহান আল্লাহ তাআলা যেভাবে আমাকে ইসলামের দিশা দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন সেভাবে এই বিপদসংকুল ঝড়ের সামনেও ইসলামের ওপর অটল থাকার শক্তি দিয়েছেন। সেই পণ্ডিতদের বিতর্ক ও সমালোচনা আমার ঈমান ও আকিদাকেই শুধু বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের মজবুত রজ্জুকে আঁকড়ে ধরার জন্য মুষ্ঠিকে শাণিত করেছে। আমার জীবনে প্রশান্তির ছায়া দান করেছে। সর্বোপরি আমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বাড়িয়েছে।

তখন থেকেই আমি একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—আমি এসব অসার ধর্ম ও বিশ্বাসের অসারতা সম্বন্ধে এমন একটি সন্তোষজনক গ্রন্থ প্রণয়ন করব, যা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে, যদিও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এত কাঠখড় পুড়াতে হয় না।

সেই থেকেই আমার মনে বিভিন্ন ধর্ম ও বিশ্বাস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং তা অপরকে জানানোর আগ্রহ গেঁথে যায়। এগুলোর সাথে ইসলামের তুলনামূলক পর্যালোচনা ঝোঁকও পেয়ে বসে। এই চিন্তা আমার মন-মগজ থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। বরং এমনটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, এই চিন্তা থেকে আমার জীবনের একটি মুহূর্তও মুক্ত ছিল না। সুতরাং আমি আহলে কিতাব ও অগ্নি উপাসকদের বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে তথ্য ও উপাত্ত আহরণে

ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেসবে নিজের উদ্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ি। আমি আশা করি, এই ময়দানে অবদান রাখা মানুষগুলোর কাতারে আমিও অংশীদার হব। সেই সাথে আমি এও কামনা করি যে, সম্পূর্ণ কাজটি সাধারণ মুসলমানদের জন্য উপকারী হবে, বিশেষ করে ওইসব নও মুসলিমের জন্য সহায়িকা হবে যারা আমার মতো পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে অহরহ।

আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি আমার হৃদয়কে ইসলামের ওপর দৃঢ় রেখেছেন, শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পার হওয়ার পর এ বিষয়ে আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া তিনি যেন এই কাজটি কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই কবুল করেন। তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম সহযোগী।

সালাত ও সালাম আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল নবি-রাসুলগণের ওপর।

—গ্রন্থকার
মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত
১০ই রমজান, ১৪০৪ হিজরি
আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বিশ্বস্ত রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পূতপবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবিদের উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে কখনো সংক্ষিপ্তাকারে আবার কখনো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা সংক্ষিপ্তাকারে বলেন—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ পাঠিয়েছি সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। [সুরা ফাতির, আয়াত : ২৪]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.

আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রাসুল রয়েছেন। যখন তাদের কাছে তাদের রাসুল ন্যায়দণ্ডসহ উপস্থিত হলো, তখন আর তাদের ওপর জুলুম হয় না। [সুরা ইউনুস, আয়াত : ৪৭]

আরেক স্থানে তিনি ইরশাদ করেন—

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً .

যে কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দিই না। [সুরা ইসরা, আয়াত : ১৫]

এভাবেই কুরআনের বহু আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা মানুষকে দ্বীন-ধর্ম ও বুদ্ধিহীন ছেড়ে দেননি। একইভাবে আল্লাহ তাআলা তার রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান করাকে মানুষের স্বভাবগত বিষয় বানিয়ে দিয়েছেন। যখনই মানুষ সিরাতে মুসতাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, দ্বীনের চাদরকে নিজেদের দেহ থেকে ছুড়ে ফেলেছে তখনই আল্লাহ তাআলা একের পর এক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন যাতে অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘায়ত না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا

এরপর আমি একের পর এক রাসুল প্রেরণ করেছি। [সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৪৪]

এই হলো সংক্ষিপ্ত বর্ণনার কিছু নমুনা। আর বিশদ আলোচনার কথা বলতে গেলে কুরআনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ আলোচনাই বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক ধর্ম এবং সিরাতে মুসতাকিম থেকে তাদের বিচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ে। এই বর্ণনার মাঝে আমরা দেখতে পাই কুরআন আলোচনা করেছে পূর্ববর্তী নবিগণের ওপর আল্লাহ তাআলার অবতীর্ণ পুস্তকসমূহ, কাফির-মুশরিককর্তৃক নবিগণের বিরুদ্ধাচরণ, হক-বাতিল ও কল্যাণ-অকল্যাণের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সম্পর্কে।

কুরআনুল কারিম এক আয়াতে ছয়টি ধর্মের আলোচনা করেছে। যেমন বলা হচ্ছে—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

যারা মুসলমান, যারা ইহুদি, সাবেয়ি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপুজক এবং যারা মুশরিক, কিয়ামতের দিন আল্লাহ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে। [সুরা হজ, আয়াত : ১৭]

একইভাবে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে মূলনীতিগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই মূলনীতিগুলো হলো :

প্রথম : কুরআনুল কারিম এ কথা সাব্যস্ত করেছে যে আল্লাহ তাআলা সকল জাতির কাছে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

দ্বিতীয় : সকল নবি-রাসুল ও তাদের ওপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনা সকল মুসলমানের ওপর ওয়াজিব।

তৃতীয় : ইসলামপূর্ব সকল ধর্মে বিকৃতি ঘটেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

(হে মুসলমানগণ) তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং এ বিষয়ে তারা তা অবগতও ছিল। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৫]

অন্য স্থানে তিনি বলেন—

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ .

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ৭৯]

চতুর্থ : কুরআন তাওহিদ ও বহু ঈশ্বরবাদের মাঝে তুলনা করে দেখিয়েছে। অতঃপর বহু ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসারতা বর্ণনা করেছে এবং এটিকে জগৎ ধ্বংসের কারণ হিসেবে অভিহিত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ .

যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ের ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২২]

পঞ্চম : কুরআন আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের আহ্বান করে। কুরআনের এই আহ্বান থেকে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে অবগতি ও ধর্মগুলোর মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনার জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। কেননা, এতে করে বিতর্ক হবে জ্ঞানগর্ভ, বুনিয়াদি ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থাতেই বিতর্ক করবে।" [সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৪৬]

ষষ্ঠ : কুরআনুল কারিম খালিক ও মাখলুকের মাঝে তুলনা করে দেখিয়েছে এবং যারা খালিক ও মাখলুককে সমজ্ঞান করে তাদেরকে অবজ্ঞা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে—

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

যিনি সৃষ্টি করে, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? [সুরা নাহল, আয়াত : ১৭]

সপ্তম : কুরআনুল কারিম ঘোষণা করে ইসলামই হলো একমাত্র সত্য ধর্ম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯]

এবং কুরআন এও বর্ণনা করে যে আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন। কেউই এতে বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে না। যেমন কুরআনে বলা হচ্ছে—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [সুরা মায়েদা, আয়াত : ৩]

পক্ষান্তরে ইসলামপূর্ব প্রতিটি আসমানি ধর্ম বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এই হলো ইসলামের কিছু বিশেষত্ব। এই ঐশী দিকনির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মগুলো নিয়ে বিষয়ভিত্তিক গবেষণা চালিয়ে আসছে।

ধর্মতত্ত্ব :

ধর্মতত্ত্বে সাধারণত তিন ধরনের বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে :

এক : ধর্মের ইতিহাস। এই অংশে ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও মানবসমাজে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এক্ষেত্রে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের চেয়ে এদিক থেকে আলাদা যে, মুসলমানরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে নিশ্চিত ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত বিধিবিধান ও শরিয়তের ক্ষেত্রে একবারে সূচনালগ্ন থেকে সনদ তথা ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রের প্রয়োগ করেছে। তাই সাহিবুশ শরিয়াহ তথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে ইসলাম ছিল আকিদা ও আহকামসহ সর্বক্ষেত্রে হুবহু সেই ইসলামই আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। অপরদিকে পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর প্রধান ব্যক্তি পর্যন্ত ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র আমরা খুঁজে পাই না। যেমন ইহুদিদের কিতাব তাওরাত। বুখতে নসরের আক্রমণের পর হারিয়ে যাওয়া তাওরাতকে পুনঃসংকলনকারী যাজক ইয়্রা থেকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কোন ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্র নেই। অথচ তাদের উভয়ের মাঝে প্রায় সাত শতাব্দীর ব্যবধান। খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদগণ নিশ্চিত করেছেন যে, যাজক ইয়্রা ছিলেন ৪৫৮ খ্রিষ্টপূর্বের। আর মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন দ্বাদশ খ্রিষ্টপূর্বের।

এ ছাড়াও খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তাদের কিতাবগুলো প্রসিদ্ধ কিছু ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ যুগে রচনা করেছেন। মসিহের যুগের সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়ে রচিত কিতাব মার্কের

সুসমাচার লেখা হয়েছে ৬৫ থেকে ৭০ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে। তাদের এই গ্রন্থগুলো দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দের আগে পরিচিত ছিল না। ২০০ খ্রিষ্টাব্দে আরিনুস এবং ২১৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লেমেন এই কিতাবগুলোর আলোচনা সামনে আনেন। প্রথমে মসিহের জীবনি সংক্রান্ত গ্রন্থের আলোচনা করেছেন প্যাপিয়াস। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর ইতিহাসবিদ। উইল ডুরান্ট তার *কিসসাতুল হাদারাহ* গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, প্রথম শতাব্দীর শেষাংশের লেখকগণ বর্তমান সময়ে প্রচলিত এসব সুসমাচার থেকে কখনোই উদ্ধৃতি দিতেন না।

এ ছাড়াও মসিহ আলাইহিস সালামের ভাষা এসমস্ত লেখকদের আয়ত্বে ছিল না। মসিহ আলাইহিস সালামের ভাষা ছিল সুরিয়ানি। অথচ এদের অধিকাংশই সুসমাচার রচনা করেছেন গ্রিক ভাষায়। সেখান থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। অতপর ল্যাটিন ভাষা থেকে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই অনুবাদকগণের পরিচিতি আজও অজানা। এই হলো আহলে কিতাবগণের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অবস্থা।

পক্ষান্তরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও পারস্যের অগ্নিপূজকদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর অবস্থা আরও নাজুক।

আমাদের জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাগুলো দীর্ঘ তিন শতাব্দী যাবৎ মৌখিকভাবে প্রচলিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকে শিলাতে লিপিবদ্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করার নির্দেশ দেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের খোঁড়াখুঁড়ির মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পেরেছি বুদ্ধ কে? কী ছিল তার শিক্ষা?

সংক্ষেপে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আমরা এ কথা বলতে পারি—এই সমস্ত প্রবক্তাগণ যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে ধর্মগুলো ধারাবাহিক বর্ণনাসূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছায়নি, যেভাবে ইসলাম আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

দুই : ধর্মদর্শন। এ থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, যেগুলোর উপর দ্বীনের ভিত্তি, যেমন আকিদা, শরিয়ত, আখলাক ও লেনদেন। এ প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে রয়েছে অতিপ্রাকৃত বিষয়াবলি যেটাকে ধর্মের ভাষায় ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হয়।

তিন : তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। এ অংশে ধর্মগুলোর পারস্পরিক তুলনার উদ্দেশ্যে এগুলো বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ধর্ম সম্পর্কিত রচনাবলি :

বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে লেখালেখি করার ক্ষেত্রে গবেষক ও পণ্ডিতগণ দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

প্রথম পদ্ধতি : প্রবর্তন বিবেচনায়

তারা বলেন : ধর্মগুলো দুধরনের। আসমানি ধর্ম যেমন : ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম প্রভৃতি। মানবরচিত ধর্ম যেমন : হিন্দু, বৌদ্ধ, জরাথ্রুস্ট, চৈনিক প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ভৌগলিক বিবেচনায়

তারা ইসলাম, খ্রিষ্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে বৈশ্বিক ধর্মের কাতারে রাখেন। আর ইহুদি, হিন্দু ও প্রাচ্যের ধর্মগুলোকে জাতিগত বা গোষ্ঠিগত ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেন।

খ্রিষ্টধর্মকে বৈশ্বিক ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি রয়েছে। কেননা, মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ছিল শুধু ইহুদি জাতিকেন্দ্রিক। মসিহ আলাইহিস সালাম এসেছেন মুসা আলাইহিস সালামের শরিয়তকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। যেমন মথি তার সুসমাচারে মসিহের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন : "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি তাহা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"[৫]

সপ্তম হিজরির ইহুদি ব্যক্তিত্ব সাদ ইবনে মনসুর কিমুনি তার *তানকিহুল আবহাস লিল মিলালিস সালাস* নামক গ্রন্থে বলেন, "তাওরাতের বিভিন্ন বিধানের পরিবর্তন যেমন শুকরের মাংসের বৈধতা, খতনা ত্যাগ করা, গোসল প্রভৃতি হাওয়ারিগণ থেকে বর্ণিত, মসিহ থেকে বর্ণিত নয়। কেননা, তিনি ইহুদি কর্তৃক ধৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওরাতের বিধানাবলি আঁকড়ে ছিলেন।" এরপর তিনি বলেন, "এই বিধানগুলোর অধিকাংশই ছিল পোলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।"

ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে খ্রিষ্টানদেরকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে পোল উত্তর-পশ্চিমের এলাকাগুলোর অভিমুখী হন। প্রথমে সিরিয়ার উত্তরে এন্টিয়ক, সেখান থেকে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের মেসা হয়ে মেসিডোনিয়া। পোল খ্রিষ্টানদের মাঝে নতুন একটি চিন্তাধারার জন্ম দেন। আর তা হলো খ্রিষ্টধর্মের বৈশ্বিক হওয়া। অথচ মসিহ আলাইহিস সালামের

[৫] মথি, ৫/১৭

দাওয়াত শুধু ইহুদি পরিমণ্ডলে সীমিত ছিল। এজন্যই দেখা যায়, ইহুদিরা যখন খ্রিষ্টানদেরকে এই মসিহি তথা খ্রিষ্টান বলে কটুক্তি করত তখন তারা অসন্তুষ্ট হতো। কেননা তারা নিজেদেরকে ইহুদি হিসেবেই বিবেচনা করতো।

পিতার তার প্রথম পত্রে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, "মসিহের নামে তোমাদেরকে কটুক্তি করা হলে সেটা তো তোমাদের জন্য খুশির বিষয়।"[৬] অনেক বিজ্ঞজনই দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেছেন যে, সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে খ্রিষ্টানদেরকে ইহুদিদের একটি উপদল বিবেচনা করা হতো। তাদের নাম ছিল নাসারা।

চার্লস গিজেনবার্ট তার *আলমসিহিয়্যাহ নাশ'আতুহা ওয়া তাতাওয়ারুহা* নামক গ্রন্থে বলেন, "খ্রিষ্টবাদ হলো একটি ইহুদি আন্দোলন।" সুনির্দিষ্টভাবে এটি প্রথম ইহুদিদের ধর্মীয় জীবনের সমস্যা নিয়ে শুরু হয়েছিল। ইহুদি পরিমণ্ডলের বাইরে এটিকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। মথির সুসমাচারের ভাষ্য অনুযায়ী মসিহ আলাইহিস সালাম বলেন, "ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[৭]

বরনাবার সুসমাচারে এসেছে : আল্লাহ আমাকে ইসরাইল কুলে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন দুর্বলদেরকে সুস্থ করার জন্য।

কুরআন অনেক আয়াতে খ্রিষ্টানদের এই হাকিকত তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

আর বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন : নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শন নিয়ে... [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

[৬] পিতর ১ম, ৪/১৬
[৭] মথি, ১৫/২৪

স্মরণ করুন, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা বললেন : হে বনি ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল : এ তো এক প্রকাশ্য জাদু। [সুরা সফ, আয়াত : ৬]

আদইয়ানুল আলাম গ্রন্থে কট্টর খ্রিষ্টান ইতিহাসবিদ হাবিব সাইদের বক্তব্যটি দেখুন। তিনি বলেন, "সুসমাচার হলো মৌলিকভাবে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত রিসালাত। এটি এককভাবে কোনো জাতি, গোষ্ঠী কিংবা দলের মানুষের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথম দিকের শিষ্যগণ শুরুতে বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেননি যে, ইহুদিবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি দূর হয়ে গেছে। কিন্তু মহাত্মন পোল এ বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, এই রিসালাত ইহুদি, অ-ইহুদি, বর্বর, গ্রিক, পুরুষ, নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য।"

আদইয়ানুল আলামিল কুবরা গ্রন্থে উলিয়াম ব্যাটনও এই মত প্রকাশ করেছেন। সবাই একথা স্বীকার করেছেন যে, ইহুদি পোলই প্রথম খ্রিষ্টধর্মকে বৈশ্বিক ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন এবং ইহুদিদের একক কোনো দল হওয়া থেকে বের করে নিয়েছেন, যাতে তাদের ঐক্যে ফাটল না ধরে। এ কারণেই পোল তার রায়ের স্বপক্ষে মসিহের বক্তব্য থেকে অকাট্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তাই আমাদের এ কথা বলার অধিকার আছে যে, খ্রিষ্টধর্মের বৈশ্বিকতা পোলের উদ্ভাবিত একটি বিদআত ও কুসংস্কার। কেননা, তিনি ভেতর থেকে ধ্বংস করার উদ্দেশেই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

ধর্মের উৎস

ধর্মের উৎসজ্ঞান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের দুটো মত রয়েছে।

প্রথম মত : ধর্মের উৎস হলো মানুষ নিজেই। যেমন বুদ্ধ দাবি করেছিলেন, তিনি নিজের সত্তার মাঝে চিন্তা করে জগতের রহস্য, জীবন-মৃত্যুর হাকিকত উন্মোচন করেছেন। বর্তমান সময়ে মহর্ষি[৮] ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে

[৮] মহর্ষি = তার নাম মহেশ যোগী। আমেরিকাতে বসবাস করেন। তিনি একটি নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেন ক্রিয়েটিভ ইন্টিলিজেন্স সাইন্স। তার প্রথম বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানকে তার পাশে জড়ো করতে সক্ষম হন। তার ধ্বংসাত্মক আদর্শের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় মহর্ষি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন আরবি ও ইসলামি রাষ্ট্রে

এই মতাদর্শের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেন। তিনি ওয়াহদাতুল উজুদ আকিদার সবচেয়ে প্রাচীন উৎস বৈদান্তিক চিন্তাধারা দ্বারা মোটাদাগে প্রভাবিত। আকিদাটি হলো, এই জগৎই একমাত্র সত্য। ঈশ্বর হলেন তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি। তিনি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নন। যেহেতু উভয়ের মৌল একই। আর আমরা যে মানবসত্তা দেখি তা শুধু দৃষ্টির বিভ্রম। হিন্দু দর্শনে এর নাম হলো মায়া।

এখানে স্বল্প পরিসরে আমরা বেদান্ত গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই গ্রন্থটি হিন্দুদের নিকট নীতি ও দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। আকারে ছোট হলেও হিন্দুদর্শনে এই গ্রন্থটির বিরাট প্রভাব রয়েছে। গ্রন্থটির রচনাকাল নিয়ে গবেষকগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে জন্ম নেওয়া গৌতম বুদ্ধ ও মসিহ আলাইহিস সালামের মাঝামাঝি সময়ে এটি রচিত হয়েছে। কেননা, এর লেখক গৌতম বুদ্ধের অধর্মীয় শিক্ষার সমালোচনা করেছেন।

গ্রন্থটিতে চারটি অধ্যায় ও ষোলটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ব্রহ্মা তথা সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ও উপাসনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে ওয়াহদাতুল উজুদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মবিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ে মুক্তিলাভের উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, পূর্ণ দাসত্ব যেটাকে সুফিদের ভাষায় পূর্ণ বিলোপ বলা হয়।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ে উপাসনায় সচেষ্ট ব্যক্তির প্রতিদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হলো, সুমহান আত্মার সাথে একীভূত হওয়া। কেননা, বেদান্ত তিনটি মূলনীতির স্বীকৃতি দেয়। সেগুলো হলো :

১। আত্মা অবিনশ্বর।

তিনি মহর্ষি ইউনিভার্সিটি খোলার প্রস্তাব দেন। রাবেতাতুল আলামিল ইসলামিতে সম্পৃক্ত থাকাকালীন আমাকে তার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আরবি ও ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে তার দাওয়াতি কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

এই ব্যক্তিটি বলেন : প্রকৃতি নিয়ে গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষ হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয় যা সীমিত দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় না। ধোঁকা ও প্রতারণার দায়ে এই ব্যক্তিটিকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল তা আজও অজানা।

২। জগৎই ঈশ্বর।

৩। সকল হাকিকতের পেছনে প্রতারণা লুক্কায়িত।

আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাচ্ছি। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে চৈনিক দার্শনিক কনফুশিয়াস (৫৫১-৪৭৯) আত্মিক ধ্যানের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি তার সাথিগণকে ধর্মীয় কিতাবাদিতে নজর দিতে নিষেধ করেন। তার চিন্তাধারা মানবদর্শনের প্রতিনিধিত্ব করত। তার শিক্ষার ভিত্তি উচ্চমার্গীয় কিছু ছিল না। কথিত আছে, তিনি তার এক শিষ্যকে মৃত্যুচিন্তা করার কারণে তিরস্কার করেন। তাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন : জীবন সম্পর্কেই যখন তোমার জ্ঞান নেই মৃত্যু সম্পর্কে কীভাবে জানবে?

এজন্যই এই সম্প্রদায়গুলোর সদস্যদেরকে অনেক অনেক কুসংস্কার ও বিভ্রান্তিতে নিপতিত হতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ যেসব সমাজ জগতের পরিণতি ও জীবনের হাকিকত জানার জন্য শুধু বুদ্ধি ও চিন্তার উপর নির্ভর করে তাদের মাঝে পৌত্তলিকতা প্রকাশ পায়। অতঃপর লোকেরা প্রাকৃতিক বস্তু যেমন গাছ-গাছালি, নদ-নদী, পাথর এবং রহস্যময় শক্তি যেমন আত্মা, ফেরেশতা, জিন প্রভৃতির পূজা করতে শুরু করে।

দ্বিতীয় মত : দ্বীনের উৎস হলো ওহি। এই মতাদর্শীরা দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন যে দ্বীন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি। আর প্রথম মানব দ্বীন সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন ওহির মাধ্যমে। ওহির মাধ্যমে তিনি তাওহিদের দ্বীন গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতির হাকিকত বা তাৎপর্য সীমিত বুদ্ধি দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়।

সকল আসমানি ধর্মের অনুসারীগণ এই মতকে গ্রহণ করেছেন। মুসলমানদের একটি জামাত তথা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, বিবেক দ্বারাই কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভালো-মন্দ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। ওহির প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তারা মানবসমাজের ব্যবস্থাপনার জন্য বিবেকান্দ্রীয়গুলোকে যথেষ্ট বলে না। বরং বিবেকান্দ্রীয়গুলোর শুদ্ধতার জন্য তারা ওহির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

এটিই হচ্ছে তাওহিদের আদিম সূত্র। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে,তাওহিদই হলো মানবসমাজের সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস। পৌত্তলিকতা হলো আহুত ঘটনা ও পশ্চাদপদ বোধের অসুস্থতা।

হুইট এবং টি এইচ ম্যান কর্তৃক সম্পাদিত এন্ট্রোলজি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ল্যাং (Lange) বুশম্যান, জুলু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতো আফ্রিকার

বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কতেক গোত্র এবং আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান কিছু গোত্রের মাঝে বড় ঈশ্বর আকিদার অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এই গোত্রগুলো হলো পরিবেশ ও সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত মানবজাতির সবচেয়ে আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একইভাবে শ্রোডিয়ার (Schroeder) প্রাচীন আর্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ব্রোকালম্যান (Brochelman) ইসলামপুর্ব সেমেটিকদের মাঝে তাওহিদের প্রমাণ দেখিয়েছেন। শেমিডেট (Schemidet) দাবি করেছেন মহান প্রভুর আকিদাটি পৃথিবীর সবগুলো প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে প্রচলিত ছিল।

মুসলিম সমাজে ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণা

ইবনে নদিমের *ফিহরাসত* গ্রন্থের আলোকে জানা যায় যে, অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে গবেষণার নিমিত্ত আরব উপদ্বীপ থেকে প্রথম গবেষক প্রতিনিধিদল বের হয়েছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে আব্বাসি খিলাফতের উজির ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকি এর সময়ে। তিনি এক ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করেন। তাকে নির্দেশ দেন সেখানকার ধর্ম ও পৌরাণিক উপাখ্যান লিখে পাঠানোর জন্য। লোকটি একটি কিতাব রচনা করে ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকির কাছে উপস্থাপন করেন। ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিনদির (মৃত : ২৫২হিজরি) হস্তাক্ষরে লিখিত হুবহু কিতাবটি ইবনে নদিমের হাতে পৌঁছায়। সেখানে হিন্দুস্থানের অবস্থা, হিন্দুদের অভ্যাস, উপাস্য সংখ্যা, পূজা-আর্চনার পদ্ধতি, উপাসনালয়ের পরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ছিল।

ইবনে নদিম তার *ফিহরিসত* গ্রন্থের নবম প্রবন্ধে বলেন : "আমি একটি কিতাব থেকে এই লেখাটি অনুলিপি করেছি ২৪৯ হিজরির মুহাররাম মাসের তিন তারিখ জুমাবারে। এই কিতাবের ঘটনা সম্পর্কে আমি অবগত নই যে কিতাবটি কার রচনা? তবে আমি পুরো কিতাবটি ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দিরি হস্তলিপিতে দেখতে পেয়েছি। এই তরজমার অধীনে কিতাবটির ঘটনা লেখকের ভাষায় এভাবে লেখা রয়েছে : কোনো কোনো ধর্মতত্ত্ববিদ বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল-বারমাকি এক ব্যক্তিকে হিন্দুস্থানে পাঠিয়েছিলেন সে দেশে পাওয়া যায় এমন কিছু ওষুধ নিয়ে আসার জন্য। পাশাপাশি সেখানকার ধর্ম সম্পর্কেও তাকে লিখিতআকারে জানাতে বলেন। তখন ব্যক্তিটি এই কিতাব লিখেন।"

মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেন :"আরবে যারা হিন্দুস্তানকে গুরুত্ব দিয়েছেন তারা হলেন বারামেকাগণ, বিশেষ করে ইয়াহইয়া বিন খালিদ।"[৯] এরপর তিনি উপাসনালয়গুলোর অবস্থা, মূর্তির নাম, হিন্দুদের দেবদেবীর পুজা-আর্চনা, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের কল্পনা প্রভৃতি বিষয় বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এ হলো হিন্দুস্থানের ধর্ম ও ধর্মানুসারীদের নিয়ে আলোচনা।

এরপর তিনি মুতাকাল্লিমিন ও মুতাযিলা সম্প্রদায় সম্পর্কে লিখিত পঞ্চম প্রবন্ধে হাসান ইবনে আইয়ুব সম্পর্কে আলাচনা করেছেন। তার সম্পর্কে বলেন : তার ভাই আলি ইবনে আইয়ুবের কাছে লিখিত একটি পত্র আছে। সেখানে তিনি খ্রিষ্টানদের জবাবি আলোচনা ও তাদের বক্তব্যের অসাড়তা বর্ণনা করেছেন।[১০]

এ থেকেই সুইস বিজ্ঞানী এডাম ম্যাটের দাবির ভুল উন্মোচিত হয়। তিনি তার *আল-হাদারাতুল ইসলামিয়া ফিল করনির রাবে* (চতুর্থ শতাব্দীতে ইসলামি সভ্যতা) নামক গ্রন্থে বলেন : "মুসলমানরা চতুর্থ শতাব্দীতে এসেই বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে।"[১১] এটি মুসলমানদের ওপর জুলুম ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। কোনো কোনো মুসলিম লেখকও তার এই বক্তব্যের অনুসরণ করেছেন। তারা মুসলমানদেরকে অন্য ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞদের কাতারে ফেলে দিয়েছেন। বাস্তবতা হলো, তারাই বরং ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ।

চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলমানদের মাঝে জ্ঞানের এই শাখাটি উন্নতি লাভ করে। এ বিষয়ে অনেক লেখকেরও আবির্ভাব ঘটে। তাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম আমরা মৃত্যুসন অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছি।

১। নবুখতি (মৃত্যু : ৩১০ হিজরি)

তার নাম হাসান ইবনু মুসা ইবনু হাসান আন-নবুখতি। *ফিরাকুশ শিয়া* গ্রন্থের লেখক। পারস্য বংশোদ্ভূত। বাগদাদে থিতু হয়েছিলেন। শিয়া ও

---

[৯] আল-ফিহরাসত, পৃষ্ঠা : ৪৮৪। হিন্দুস্থান নিয়ে বরমকিদের এই গুরুত্বারোপের কারণ সম্ভবত তাদের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারনে। বরং বলতে গেলে তারা ছিলেন তুর্কিস্তানে বৌদ্ধদের উপসনালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। বরমকি শব্দের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ দাঁড়ায় উপাসনালয়ের প্রধান।

[১০] পৃষ্ঠা : ২৪৬

[১১] আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা পোষণ করতেন। *আল-আরা ওয়াদ-দিয়ানাত* নামে তার আরেকটি কিতাব আছে। তবে তিনি কিতাবটি পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। তার আরেকটি কিতাবের নাম হলো *আররদ্দু আলা আসহাবিত তানাসুখ*।

২। মাসউদি (মৃত্যু : ৩৪৬ হিজরি)

তার পুরো নাম আলি ইবনুল হুসাইন ইবনু আলি। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বংশধর। তিনি একাধারে ইতিহাসবেত্তা, পরিব্রাজক ও গবেষক। বাগদাদের অধিবাসী মাসউদি ছিলেন মুতাযিলা সম্প্রদায়ের লোক। তার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *আল-মাকালাত ফি উসুলিদ দিয়ানাত* ও *আলমাসাইলু ওয়াল মিলাল ফিল মাযাহিবি ওয়ান নিহাল*।

৩। আল-মাসবাহি (মৃত্যু : ৪২০ হিজরি)

তার নাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ বিন আহমদ আল-মাসবাহি। হারান প্রদেশের অধিবাসী। সাহিত্য ও ইতিহাসের পণ্ডিত। বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তার লিখিত গ্রন্থের নাম *দরকুল বুগইয়া ফি ওয়াসফিল আদইয়ান ওয়াল ইবাদাত*।

৪। আবু মনসুর আল-বাগদাদি (মৃত্যু : ৪২৯ হিজরি)

তিনি আব্দুল কাহের আল-বাগদাদি আল-ইসফারাইনি। তিনি উসুলের ইমাম ছিলেন। তার গ্রন্থ *আল-ফরকু বাইনাল ফিরাক* (মুদ্রিত)। ধর্ম সম্পর্কে তার কিতাব *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল*। তবে কিতাবটি সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না।

৫। আল-বেরুনি (মৃত্যু : ৪৪০ হিজরি)

তার নাম মুহাম্মদ ইবনু আহমদ আবু রাইহান আল-খাওয়ারেজমি। কয়েক বছর হিন্দুস্থানে ছিলেন। এ সময়ে তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ, আকিদা-বিশ্বাস ও চাল-চলন সম্পর্কে অবগত হন। এরপর তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *তাহকিকু মা লিল হিন্দি মিন মকুলাতিন মকবুলাতিন ফিল আকল আও মরযুলাহ* রচনা করেন। এটি মুদ্রিত পাওয়া যায়।

এডাম ম্যাট বলেন : তিনি তার কিতাবে হিন্দুস্থানের সঠিক বর্ণনা বিবৃত করেছেন। এটি কোন বিতর্কের কিতাব নয়। তাই প্রতিপক্ষ এর বিরোধীতা করেনি। ...[১৭]

৬। ইবনে হাযম (মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরি)

তার নাম আলি ইবনে আহমদ ইবনে সাইদ ইবনে হাযম। জাহেরি মাজহাবের ইমাম এবং আন্দালুসের মুহাদ্দিস। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে লিখিত প্রচুর কিতাব সম্পর্কে তার অবগতি ছিল। তিনি দেখলেন সেগুলোর কতেক অতি দীর্ঘ আর কতেক অতি সংক্ষিপ্ত। কতেক প্রয়োজনীয় আলোচনামুক্ত আর কতেক অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় ভরপুর। এগুলোতে রয়েছে ভুল ও অহেতুক আলোচনা। তাই তিনি এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলেন। এবং ইসলামের ইতিহাসে ইহুদি, খ্রিষ্টান, তারকাপুজারি ও পৌত্তলিকদের সম্পর্কে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কিতাবটি রচনা করেন। কিতাবটির নাম হলো *আল-ফসলু ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান-নিহাল*। এটি বাজারে মুদ্রিত পাওয়া যায়।

৭। শাহরাসতানি (মৃত্যু : ৫৪৮)

তার নাম মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম আবুল ফাতাহ। তিনি শাহরাসতানি নামে পরিচিত। একজন মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বের ইমাম। তিনি তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল* সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক গ্রন্থ সম্পর্কে অবগতির পরই রচনা করেছিলেন। তার কিতাবের ভূমিকা থেকে এটাই বুঝা যায়। তিনি সেখানে বলেন : "যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের রচনা ও মনোবৃত্তির অনুগামী ব্যক্তিবর্গের আলোচনা অধ্যয়ন, এগুলোর উৎস সম্পর্কে অবগতি, প্রচলিত ও অপ্রচলিত বিষয়সমূহ আহরণ করার তাওফিক দিলেন, তখন আমি এগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশ করতে মনস্থ করলাম যেখানে সকল ধর্মাবলম্বীদের আদর্শ সংকলিত হবে। ফলে শিক্ষা অর্জনে আগ্রহীদের জন্য এতে খোরাক থাকবে।" বাস্তবেই তার কিতাবটিকে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে জানার বিশ্বকোষ বিবেচনা করা হয়। ইবনে হাযমের কিতাবটির সাথে

---

১২ খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮৫

সাথে তার কিতাবটিও মুদ্রিত পাওয়া যায়। এ ছাড়াও এটি মুহাম্মদ সাইয়িদ কিলানির তাহকিকসহও ছাপা হয়েছে।

৮। আবু উবাইদা আল খাযরাজি (মৃত্যু : ৫৮২ হিজিরি)

তার নাম আবু জাফর আহমদ বিন আবদুস সামাদ বিন আবু উবাইদা আল-আনসারি আল-খাযরাজি। তিনি আন্দালুসের ফকিহ ও *বাইনাল মাসিহিয়্যাতি ওয়াল ইসলাম* গ্রন্থের লেখক।

আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানদের হাতে কর্ডোভার পতন ঘটালেন, সেখানকার রাজত্ব যখন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, অধিবাসীরা যখন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল তখন কিছু খ্রিষ্টান পাদরি মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসে সন্দেহের বীজ বপন করার হীন চেষ্টা শুরু করে। পাদরি হান্না মাক্কার দুঃসাহস দেখিয়ে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিত্ব আবু উবাইদা আল-খাযরাজিকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানায়। তখন আবু উবাইদা তার ধারণাগুলোর অপনোদন করে এবং আল্লাহর দীনে সে কী কী বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ব্যাখ্যাসমেত গ্রন্থ রচনা করেন। তার এই গ্রন্থটি ড. মুহাম্মদ শামার তাহকিকসহ প্রকাশিত হয়েছে।

কিতাবটিতে যেসব বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে তন্মধ্যে ছিল—

খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ, মসিহের ক্রুশারোহণ, আদিপাপ, মসিহ আলাইহিস সালামের মুজিযা, হাওয়ারিগণের মুজিযা, মসিহের প্রকৃতি, চার্চসমূহে প্রকাশিত অতিপ্রাকৃত বিষয়, তাওরাত ও ইনজিলের বিধিবিধান, খ্রিষ্টধর্মের তালাক, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে একাধিক স্ত্রী, তিন ধর্মে যুদ্ধের বিধান, তাওরাত ও ইনজিলের বিকৃতি, তিন ধর্মে আখিরাতের প্রতিদানের ধারণা প্রভৃতি।

৯। ইবনু তাইমিয়া (মৃত্যু : ৭২৮ হিজরি)

শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনু আবদুল হালিম বিন আবদুস সালাম আল-হাররানি *আল-জাওয়াবুস সাহিহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসিহ* গ্রন্থের লেখক। এই কিতাবটি মসিহ আলাইহিস সালামের আনীত দ্বীনে নাসারাদের মিথ্যা রটনার খণ্ডনে রচিত একটি সমৃদ্ধ কিতাব। এটিও প্রকাশ পেয়েছে।

১০। ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি)

তিনি ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর আদ-দামেশকি। ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ নামে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি *হিদায়াতুল হিয়ারা ফি আজবিবাতিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা* নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই কিতাবটি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাপা হয়।

এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন ধর্ম ও দল-উপদল সম্পর্কে রচনা চলতে থাকে। পাশাপাশি ইসলামের শত্রু হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন অভিযোগ খণ্ডনে হিন্দুস্থানের ওলামাগণের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা রয়েছে। খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে শায়খ রহমতুল্লাহ বিন খলিলুল্লাহ কিরানবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *ইযহারুল হক লিবায়ানি তাহরিফিল ইয়াহুদ ওয়ান নাসারা ফিল কুতুবিল মুনাযযালাহ* রচনা করেন। এই কিতাবটি ইসলামি গ্রন্থজগতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজিরবিহীন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কিতাবটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।

ড. আহমদ হিজাযি আসসাকা ইযহারুল হকের ভূমিকায় বলেন :"শায়খ রহমতুল্লাহ ১২৮১ হিজরিতে তুরস্কের কনস্টান্টিনোপোলে আরবি ভাষায় কিতাবটি রচনা করেন। এরপর ইবরাযুল হক নামে এটি তুর্কি ভাষায় অনূদিত হয়। এরপর উসমানি হুকুমত ইংরেজি, ফরাসিসহ ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় এটি অনুবাদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। এ সব সংস্করণের মধ্যে রয়েছে ১২৯৪ হিজরি, ১৩০৫ হিজরি, ১৩১৬ হিজরি, ১৩০৯ হিজরি ও ১৩১৭ হিজরির সংস্করণ। প্রফেসর সলিমুল্লাহ এটিকে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু অদ্যবদি এটি ছাপা হয়নি। শায়খ গোলাম রায়নদিরি এটিকে গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন। একইভাবে একজন গুজরাটি আলেম এটিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

সর্বশেষ এই কিতাবটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়। শায়খ (মুফতি) মুহাম্মদ শফি রহ. এর সন্তান শায়খ মুহাম্মদ তাকি উসমানি দা. বা. এর টিকা লিখেন।

খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ এই কিতাবের বিষয়বস্তুকে স্বীকৃতি দিয়েছে। হিন্দুস্থানের আরও অনেক ওলামায়ে কেরামের হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে উপযুক্ত ও সফল উদ্যোগ রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ

কিছু হিন্দু ও শিখ রাজন্যবর্গের সহায়তায় হিন্দুস্থানে মুসলিম মুগল শাসনের বিপরীতে তাদের উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম সেখানে অভিযুক্তের কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ে। একদিক থেকে হিন্দুদের আক্রমণ। অপর দিক থেকে ইংরেজদের আক্রমণ। এ সময়ে হিন্দুদের মধ্য থেকে- তাদের ভাষ্য অনুযায়ী- কিছু সংস্কারমনস্ক নেতৃবর্গের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিলেন দয়ানন্দ শাস্ত্রী (১৮৩৪-১৮৭৭)। তিনি আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যথার্থ প্রকাশ নামে তিনি বিপজ্জনক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও তীব্রভাবে ইসলামের উপর আক্রমণ করেন। আর্যসমাজ গ্রন্থটির পক্ষে একপেশে নীতি অবলম্বন করে। তারা গ্রন্থটিকে হিন্দুস্থান ও বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে। উল্লেখ্য এককভাবে হিন্দুস্থানে চৌদ্দটিরও বেশি ভাষা আছে। অতঃপর এই বিষাক্ত গ্রন্থটি হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে মুসলমানরা অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তাআলা আহলে হাদিসের নেতা সানাউল্লাহ অমৃতসারিকে প্রস্তুত করে দিলেন। তিনি তার কলমকে প্রসারিত করলেন। হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে লাগলেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'হক প্রকাশ', যা তিনি দয়ানন্দের গ্রন্থের খণ্ডনে লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দয়ানন্দের অজ্ঞতা, আল্লাহ কিতাবের বিকৃতকরণ ও আর্যসংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। একইভাবে তিনি খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন পুস্তক যেমন, আল-ইসলাম ওয়াল মসিহিয়্যাহ, তাকাবুলে সালাসা প্রভৃতি গ্রন্থেরও খণ্ডন করেছেন। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে তিনি প্রকাশ্যে বিতর্কের আহ্বান জানান। মৃত্যু পর্যন্ত তার এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান ছিল। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

সবকিছু ভুলে গেলেও শায়খ ইমামুদ্দিন রামনগরি রহ. এর কৃতিত্ব ভোলার মতো নয়। তিনি সারাটা জীবন উর্দু ও হিন্দি ভাষায় হিন্দু ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে লিখে গেছেন। তার গ্রন্থগুলো দ্বারা অনেক হিন্দু যুবক প্রভাবিত হয়। তাদের অনেককেই আল্লাহ তাআলা ইসলামের হিদায়াত দান করেন। শায়খ রামনগরি ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। বিভিন্ন বাতিল ধর্মের খণ্ডনে তিনি বিশটিরও বেশি গ্রন্থ রেখে যান।

এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে আমি ইঙ্গিত করতে চাই। তা হলো হিন্দু লেখকদের ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণার কিছু কারণ আছে। মুসলমানরা দীর্ঘ আট শতাব্দী যাবৎ শাসন করা সত্ত্বেও তারা ইসলামি গ্রন্থগুলোকে হিন্দুস্থানের ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ নেননি। সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, যে সংস্কৃতকে একটি প্রধান ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো এ ভাষাতেই রচিত। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যবিদদের লিখিত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করেন যে প্রাচ্যবিদরা ইসলামের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করত না। এর পর তারা নির্ভর করত শিয়াদের রচনার ওপর। হিন্দুস্থানে ইসলাম সম্পর্কে ভীনদেশি ভাষা যেমন ইংরেজি ইত্যাদিতে লেখালেখির কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাদের অধিকাংশই শিয়া।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করি। আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য হিন্দি ভাষায় লিখিত সবচেয়ে বড় কলেবরের গ্রন্থটির নাম *বিশ্ব ধর্ম* এর লেখক বিহারি লাল বরমা। এই গ্রন্থটির পঞ্চম অধ্যায় ইসলাম সম্পর্কে। লেখক যেসব রেফারেন্স বই থেকে ইসলাম সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করেছেন সেগুলোতে নজর বুলিয়ে আমি মুসলিম লেখকদের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ তালিকাতে পাইনি। এখানে বাস্তবতা উপলব্ধি করার জন্য পাঠক সমীপে রেফারেন্স বইগুলোর তালিকা উপস্থাপন করা উচিত মনে করছি।

প্রথম : *ইসলাম ধর্ম কি রুপরেখা*। লেখক রাহুল সেন চক্রবর্তী হিন্দু।

দ্বিতীয় : *আইয়ামুল ইসলাম*। লেখক মহেষ প্রসাদ হিন্দু।

তৃতীয় : *যথার্থ প্রকাশ*। লেখক দয়ানন্দ। তার আলোচনা আগে করা হয়েছে।

চতুর্থ : *তরজমাতু মাআনিল কুরআন*। লেখক মুহাম্মদ আলি কাদিয়ানি (লাহোরি)।

পঞ্চম : *Mohammad The Prophet Of Desert*। লেখক কে এল কাব্য।

ষষ্ঠ : *Philachfi Of Qura-an*। লেখক জি সরওয়ার।

সপ্তম : *Nation Of Islam*। লেখক মির্জা নাদের বেগ শিয়া।

অষ্টম : *আলইসলাম* লেখক এনি বাসন্তি।

নবম : *Islamic Culture*। লেখক এ ফয়েজ শিয়া।

এইগুলো হচ্ছে রেফারেন্স বই। ইসলাম সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেখক যেগুলোর ওপর নির্ভর করেছেন। এই হতভাগা ইসলাম সম্পর্কে আর কিই বা লিখবে বলে আশা করা যায়? অথচ তার এই গ্রন্থটি এখন পর্যন্ত বহুবার ছাপা হয়েছে এবং এটি বিশিষ্ট-সাধারণ নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ।

তাই সেসময় থেকে নিয়ে অদ্যবধি মুসলমানদের জন্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বকোষ রচনা করা জরুরি, যাতে এটি ব্যাপকভাবে সমস্ত অমুসলিমদের এবং বিশেষভাবে অমুসলিম লেখকদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলাই উত্তম অভিভাবক এবং সাহায্যকারী।

—লেখক

মদিনা মুনাওয়ারায় লিখিত
১০ রমজান ১৪০৪ হিজরি
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. অবিভক্ত ভারতের আজমগড়ের একটি সাধারণ হিন্দু পরিবারে ১৩৬২ হিজরি মোতাবেক ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত তিনি সেখানেই লেখা-পড়া করেন। এ সময়ে তিনি ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়নের পর তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিশেষ করে তিনি শায়খ আবুল আলা মওদুদি রহ. এর *দ্বীনে হক* পুস্তিকাটি পড়ে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে আজমগড় শিবলি কলেজে পড়াকালীন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল বঙ্কেরাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নাম পাল্টে রাখেন ইমামুদ্দিন। পরবর্তীতে হিন্দুদের নির্যাতনের ভয়ে তিনি পুনরায় নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রাখেন। প্রথম দিকে গোপনে সালাত ও সাধ্যমতো ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করলেও একসময় তা পরিবারে জানাজানি হয়ে যায়। তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার পিতা ও আত্মীয়স্বজনরা মেনে নিতে পারেনি। তাকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা পুরোদমে চেষ্টা করতে থাকেন। তারা তার হাতখরচ ও লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যার হুমকি দেয়। প্রাণনাশের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে তিনি পাকিস্তান হিজরত করেন।

পাকিস্তানে তিনি শায়খ আবুল আলা মওদুদি রহ. এর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামি কর্তৃক পরিচালিত একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মাদরাসার ন্যায় উক্ত মাদরাসায়ও ফিকহে হানাফি অনুযায়ী পাঠদান করা হতো। কিন্তু তিনি ফিকহি ও ফিকরি দিক থেকে এই

জামাতের সাথে একমত হতে পারেননি। এ সম্পর্কিত আলোচনা তিনি তার *আবু হুরাইরা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি সৌদি আরবে হিজরত করেন। সেখানে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটিতে হাদিস নিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। এরপর তিনি মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি হাদিস, তাফসির, ধর্মতত্ত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের প্রতি তার ঝোঁক ছিল প্রবল।

কর্মজীবনে ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. প্রথমে মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির জেনারেল সেক্রেটারির অফিসের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মদিনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তিনি সেখানকার হাইআতুত তাদরিসের (শিক্ষক পরিষদ) সদস্য মনোনীত হন। ধীরে ধীরে তিনি প্রফেসর হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি সেখানকার কুল্লিয়াতুল হাদিসের (হাদিস ফ্যাকাল্টি) প্রধান মনোনীত হন। এ সময়ে তিনি ছাত্রদের গবেষণাপত্রের সুপারভিশনের পাশাপাশি সহিহুল বুখারি, সহিহ মুসলিমসহ বিভিন্ন বিষয়ে দরস দিতেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমিকে সৌদি সরকার অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করে। তৎকালীন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামির সেক্রেটারি শায়খ মুহাম্মদ বিন আলি আল-হারাকানের সুপারিশে তিনি সৌদি আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি রহ. জীবনের অধিকাংশ সময় ইলমে নববির খেদমতে ব্যয় করেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতেন। সৌদি আরবের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আরবি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। পাশাপাশি অনেকগুলো কিতাবের তাহকিকও (সম্পাদনা) তার কলমে সম্পন্ন হয়।

হিজরত করে সৌদি আরবে থিতু হলেও ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমি ভারতে নিজ পরিবারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পিতা-

মাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও যোগান দিতেন। তিনি সর্বদা পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। কিন্তু সামাজিক লজ্জার অজুহাতে তারা সবসময় তা এড়িয়ে যেতেন। এতদসত্ত্বেও পিতা-মাতার প্রতিসদাচারে তিনি কোনরূপ ত্রুটি করতেন না।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা, তাহকিক ও টিকা সংযোজন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আলজামেউল কামিল ফিল আহাদিসিস সহিহিশ শামিল (১২ খণ্ড)।

২. ইবনে তাল্লা কর্তৃক রচিত আকজিয়াতু রাসুলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তাহকিক ও টিকা সংযোজন)।

৩. আবু হুরাইরা রা. ফি দওই মরবিয়্যাতিহি।

৪. আল-ইয়াহুদিয়্যা ওয়াল মসিহিয়্যা।

৫. ফুসুলুন ফি আদইয়ানিল হিন্দ।

৬. আল মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা (তাহকিক)।

৭. আলমিন্নাতুল কুবরা শরহু ও তাখারিজুস সুনানিস সুগরা।

৮. দিরাসাতুন ফিল জরহি ওয়াত তাদিল।

৯. আমালি ইবনু মারদুয়াই (তাহকিক)।

১০. মুজামু মুসতালাহিল হাদিস ওয় লাতাইফুল আসানিদ।

১১. আততামাসসুক বিস সুন্নাহ ফিল আকাইদি ওয়াল আহকাম।

১২. দাওয়াতুল কুরআন।

১৩. কুরআন এনসাইক্লোপিডিয়া।

১৪. কুরআন কি শিতল ছায়া।

এছাড়াও তার বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ মদিনা ইউনিভার্সিটি জার্নালসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই মহান ব্যক্তি বিগত ৯ ই জিলহজ ১৪৪১ হিজরি মোতাবেক ৩০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার আরাফার দিনে ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও বরেন্য ব্যক্তিবর্গ শোক প্রকাশ করেন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের দর্পণে ইহুদি জাতি-৬১

কানানিদের (Canan) আদি উৎস ৬১
হাইকলে সুলাইমানি ও মসজিদে আকসা ৬৪

খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-৬৯

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গ ৭৫
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের সময় মিশরের অধিবাসী হেক্সোসদের পরিচয় ৭৮
জবিহুল্লাহ হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম ৮০
ইবরানি কারা? ৮৬

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের স্বপরিবারে মিশর গমন-৯১

ফিরআউনের নির্যাতন থেকে বনি ইসরাইলকে চিরমুক্তির লক্ষ্যে মুসা আলাইহিস সালাম-এর প্রেরণ ৯৯
বনি ইসরাইলকে নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের মিশর ত্যাগ ১০৮
মিশর ত্যাগের তারিখ ১১৪
বনি ইসরাইলের মিশরে অবস্থানকাল ১১৫

ইউশা ইবনে নুন-১১৭

বিচারকগণের ভূমিকা ১২৮
রাজাদের যুগ ১৩০

কুরআনের দর্পণে ইহুদি জাতি-১৪০

১। আল্লাহ এবং আখিরাতকে অস্বীকার ১৪০
২। তাওরাতকে অস্বীকার ১৪১
৩। আল্লাহ তাআলাকে উপহাস করা ১৪১

৪। প্রতিশ্রুত নবিকে অস্বীকার ১৪১
৫। সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ও সত্যকে গোপন করা ১৪২
৬। কপটতা ১৪২
৭। অসৎকাজে নিষেধ ছেড়ে দেওয়া ১৪৫
৮। কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ১৪৫
৯। আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি ১৪৬
১০। চুক্তি ভঙ্গ করা ১৪৭
১১। নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান দাবি করা ১৪৮
১২। অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ ১৪৯
১৩। যুদ্ধক্ষেত্রে কাপুরুষতা ১৪৯
১৪। দুনিয়াপ্রীতি— ১৫০

ইহুদিদের ধর্মীয় গ্রন্থ-১৫১

পুরাতন নিয়ম ১৫১

১ম অংশ : তাওরাত তথা মুসা আলাইহিস সালামের পুস্তকসমূহ-১৫৯

১ম পুস্তক : আদিপুস্তক ১৫৯
দ্বিতীয় পুস্তক : যাত্রাপুস্তক ১৬৪
দশ আদেশ বা আজ্ঞা ১৬৫
ইহুদিদের অন্যান্য উৎসব ১৬৭
তৃতীয় পুস্তক : লেবীয় পুস্তক ১৬৮
চতুর্থ পুস্তক : গণনা পুস্তক ১৬৮
পঞ্চম পুস্তক : দ্বিতীয় বিবরণ ১৭০

দ্বিতীয় অংশ

ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ-১৭২

এক. যিহোশুয় এর পুস্তক ১৭২
দুই. বিচারকগণের পুস্তক ১৭৪
পুস্তকের আলোচ্য বিষয় ১৭৫
তিন. রুতের বিবরণ ১৭৬
চার, পাঁচ, ছয় ও সাত. শমুয়েল ও রাজাবলি ১৭৭
আট ও নয়, বংশাবলি ১ম ও ২য় ১৭৯
দশ ও এগারো, ইয্রা ও নহমিয় ১৭৯
বারো, ইষ্টের ১৮০

তৃতীয় অংশ

গীতপুস্তক-১৮২

এক. ইয়োব ১৮২
২. দাউদ গীত ১৮৫
৩. ৪. ৫. সুলেমান কাহিনি ১৮৭

নবিগণের পুস্তক-১৮৯

মোট সংখ্যা ১৭ টি ১৮৯
১. যিশাইয় ১৮৯
২. যিরমিয় ১৯০
৩. *যিরমিয়* এর বিলাপ ১৯০
৪. যিহিস্কেল ১৯১
৫. দানিয়াল ১৯২
৬. হোশেয় ১৯৩
৭. যোয়েল ১৯৩
৮. আমোষ ১৯৪
৯. ওবদিয় ১৯৪
১০. যোনা ১৯৪
১১. মিখা ১৯৭
১২. নহম ১৯৭
১৩. হবককুম ১৯৭
১৪. সফনিয় ১৯৭
১৫. হগয় ১৯৮
১৬. সখরিয় ১৯৮
১৭. মালাখি ১৯৮

পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-২০২

ভাষা ২০২
১। ইবরানি বা হিব্রু ভাষা ২০২
২। আরামীয় ভাষা ২০৩
৩। ইউনানি বা গ্রিক ভাষা ২০৩
তাওরাত ২০৪
তাওরাত লিপিবদ্ধকরণের পর্যায়সমূহ ২০৫
তাওরাত সংকলনের বিভিন্ন স্তর ২১১
মূলনীতিগুলো হলো— ২১৪

পুরাতন নিয়মের অনুলিপি-২১৭

১। হিব্রু ২১৭
২। সামেরিয়া (Samaritan) ২১৮

পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি-২১৯

পুরাতন নিয়মের প্রাচীন অনুবাদ ২২৪
১। গ্রিক অনুবাদ ২২৪
২। ক্যালডিয়ান অনুবাদ ২২৬
৩। ল্যাটিন অনুবাদ ২২৬
৪। ইথিওপিয়ান অনুবাদ ২২৬
৫। গোথিক (Gothic) অনুবাদ ২২৭
৬। আরমেনিয় অনুবাদ ২২৭
৭। আরবি অনুবাদ ২২৭

আলোচনার সারনির্যাস-২২৯

ইহুদিদের দল-উপদল-২৩২

১। চ্যাশিদিম (Chasidim) ২৩৩
২। সাদ্দুকি (Sadducees) ২৩৭
এ সম্প্রদায়ের আকিদাগত বৈশিষ্ট্য ২৩৭
ধর্মীয় উৎসগত বৈশিষ্ট্য ২৩৮
মসিহ আলাইহিস সালামের সাথে সাদ্দুকিদের সম্পর্ক ২৩৮
৩। ইনানিয়্যাহ/ কুররাইয়্যাহ সম্প্রদায় ২৪০
ইহুদি ২৪১
৪। সামেরাহ ২৪২

তালমুদ (TALMUD)-২৪৪

লিখিত ওহি ২৪৪
অলিখিত বা মৌখিক ওহি ২৪৪
তালমুদের প্রকার ২৪৭
তালমুদের গোপনীয়তা ২৪৮

তালমুদের কয়েকটি বাণী-২৫১

প্রভুর মর্যাদা প্রসঙ্গে ২৫১
ইহুদিদের রুহ সম্পর্কে ২৫২

অ-ইহুদির হারানো বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ ২৫২
অ-ইহুদির সাথে প্রতারণা বৈধ ২৫২
অ-ইহুদি সম্পর্কে তালমুদের দৃষ্টিভঙ্গি ২৫৩
তালমুদ ও মসিহ আলাইহিস সালাম ২৫৪
শপথ সম্পর্কে ২৫৫
অ-ইহুদি নারী সম্পর্কে ২৫৫
ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২৫৮
তালমুদের ভাষা ২৬০
জায়নবাদী প্রটোকল ২৬১
প্রটোকল এক ২৬৩
প্রটোকল দুই ২৬৪
প্রটোকল তিন ২৬৪
প্রটোকল চার ২৬৫
প্রটোকল পাঁচ ২৬৫
প্রটোকল সাত ২৬৫
প্রটোকল এগার ২৬৫
প্রটোকল টৌদ্দ ২৬৬
প্রটোকল সতেরো ২৬৬
প্রটোকল উনিশ ২৬৬
প্রটোকল চব্বিশ ২৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

মসিহ আলাইহিস সালাম-২৭১

মসিহ আলাইহিস সালামের বংশ পরম্পরা ২৭৫
আপত্তি এক ২৭৯
আপত্তি দুই ২৭৯
আপত্তি তিন ২৭৯
আপত্তি চার ২৭৯
আপত্তি পাঁচ ২৮০
আপত্তি ছয় ২৮০
আপত্তি সাত ২৮০
আপত্তি আট ২৮০
আপত্তি নয় ২৮০
আপত্তি দশ ২৮১

আপত্তি এগারো ২৮১
এক ২৮৮
দুই ২৮৯
তিন ২৮৯
চার ২৮৯
পাঁচ ২৮৯
মুজিযা এক ২৯০
মুজিযা দুই ২৯০
মুজিযা তিন ২৯১
মুজিযা চার ২৯১
মুজিযা পাঁচ ২৯১
মুজিযা ছয় ২৯১

মসিহ আলাইহিস সালামের শিষ্যদের তালিকা-২৯৩

পর্যালোচনা ২৯৫
ইহুদিরা মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণ ২৯৬

মসিহ আলাইহিস সালামের ঊর্ধ্বারোহণের পর খ্রিষ্টানদের অবস্থা-৩২৪

দ্বিতীয় শতাব্দী ৩২৮
তৃতীয় শতাব্দী ৩২৯
চতুর্থ শতাব্দী ৩৩২

আল-কুরআনে মসিহ আলাইহিস সালাম-৩৩৫

মাতা মারইয়াম ও তার জীবন— ৩৩৫
মসিহ আলাইহিস সালামের জন্ম ৩৩৭
মসিহ আলাইহিস সালামের মুজিযা ৩৩৮
বনি ইসরাইলের নবি ঈসা মসিহ আলাইহিস সালাম ৩৪০
মসিহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত ৩৪১
মসিহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও অন্যান্য রাসুলগণের মতো একজন রাসুল ৩৪২
মসিহ আলাইহিস সালামের ওপর নাজিলকৃত কিতাব ইনজিল ৩৪৪
মসিহ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান ৩৪৪

মসিহ আলাইহিস সালামের প্রভুত্বের দাবিদারেরা কাফের ৩৪৬
মসিহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অতিরঞ্জনকারী আহলে কিতাবদের প্রতি কুরআনের নিন্দা ৩৪৭
মসিহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানো অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হয়নি, উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে : ৩৪৮
কিয়ামতের আগে মসিহ আলাইহিস সালামের অবতরণ ৩৪৯

খ্রিষ্টধর্মে ইহুদি পোলের প্রভাব এবং তাওহিদ (একত্ববাদ) থেকে পৌত্তলিকতার দিকে যাত্রা-৩৫০

পোলের খ্রিষ্টধর্মীয় জ্ঞানের উৎস ৩৫৫
সবার ঐকমতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ৩৫৯

খ্রিষ্টধর্মে পোল কর্তৃক উদ্ভাবিত বিদআতসমূহ-৩৬৪

খ্রিষ্টধর্মের মৌলিক উৎসসমূহ-৩৭০

খ্রিষ্টানদের ওপর নেমে আসা বিপর্যয় ৩৭১
পোল কর্তৃক খ্রিষ্টানদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ ৩৭১

প্রথম প্রকার : চার সুসমাচার-৩৭৭

মথির সুসমাচার ৩৭৭
মার্কের সুসমাচার ৩৮০
লুকের সুসমাচার ৩৮২
যোহনের সুসমাচার ৩৮৪

সুসমাচারের বিষয়বস্তু-৩৮৮

এক. ঘটনাবলি ৩৮৮
দুই. আকিদা-বিশ্বাস ৩৮৮
তিন. শরিয়ত তথা বিধিবিধান ৩৯০
চার. বিবাহ ও পরিবার গঠন ৩৯২
প্রথম প্রকার ৩৯৩
এক. রোমিয়দের প্রতি লিখিত চিঠি ৩৯৩
দুই ও তিন. করিন্থিয়বাসীদের প্রতি লিখিত দুটি চিঠি ৩৯৪
চার. গালাতিয়বাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি ৩৯৪
পাঁচ. ইফিস শহরের অধিবাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি ৩৯৪
ছয়. ফিলিপি নগরের অধিবাসীদের প্রতি লিখিত চিঠি ৩৯৪
সাত. কলসিয় নগরের অধিবাসীদের নিকট লিখিত চিঠি ৩৯৫

আট ও নয়. থিসলনিকিয় নগরের অধিবাসীদের প্রতি প্রেরিত দুটি চিঠি ৩৯৫
দশ ও এগারো. তিমথিয়ের প্রতি লিখিত দুটি চিঠি ৩৯৫
বারো. তিতের প্রতি প্রেরিত চিঠি ৩৯৫
তেরো. ফিলিমনের প্রতি লিখিত চিঠি ৩৯৫
চৌদ্দ. ইবরিয়দের প্রতি প্রেরিত চিঠি ৩৯৬
দ্বিতীয় প্রকার : ক্যাথলিক পত্রসমূহ ৩৯৬
এক. যাকোবের পত্র ৩৯৬
দুই ও তিন. পিতরের দুটি চিঠি ৩৯৭
চার, পাঁচ ও ছয়. যোহনের তিনটি চিঠি ৩৯৭
সাত. যিহুদার পত্র ৩৯৭
তৃতীয় প্রকার ৩৯৮
প্রেরিতদের কার্যবিবরণী ৩৯৮
যোহনের স্বপ্ন বা প্রকাশিত কালাম ৩৯৯
প্রথম স্তর তথা সর্বজন সমাদৃত পুস্তকাবলি ৪০০
দ্বিতীয় স্তরের পুস্তকাবলি ৪০০
তৃতীয় স্তরের পুস্তকসমূহ ৪০০
উক্ত উৎসগুলোতে পোলের চিন্তাধারার প্রভাব ৪০৩

পুরাতন ও নতুন নিয়মের নুসখা-৪০৫

প্রথম. ভ্যাটিক্যান সংস্করণ ৫০৪
পুরাতন নিয়মের ৪০৬
নতুন নিয়মের ৪০৬
দ্বিতীয়, আলেকজান্দ্রিয়া সংস্করণ (Alexandrian version) : ৪০৬
তৃতীয়, সিনাই সংস্করণ ৪০৬
অ্যাপোক্রিফা বা গোপন পুস্তক ৪০৭

ঈসা আলাইহিস সালামের ইনজিল-৪০৯

বরনাবা ও তার সুসমাচার-৪১৩

বরনাবা ৪১৩
প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থে বরনাবার সুসমাচার ৪১৬
কখন পাওয়া গিয়েছিল বরনাবার সুসমাচার? ৪১৭
সুসমাচারের লেখক হওয়ার জন্য হাওয়ারি হওয়া শর্ত? ৪১৮
সুসমাচারটিকে খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক বরনবার রচনা হিসেবে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ৪২১

পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ-৪২৭

ভবিষ্যদ্বাণী এক ৪২৭
ভবিষ্যদ্বাণী দুই ৪২৯
ভবিষ্যদ্বাণী তিন ৪৩১
ভবিষ্যদ্বাণী চার ৪৩৪
ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচ ৪৩৫
ভবিষ্যদ্বাণী ছয় ৪৩৮

নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ-৪৪২

এক ৪৪৪
দুই ৪৪৫
তিন ৪৪৬
বরনাবার সুসমাচার থেকে কিছু উদ্ধৃতি ৪৫২
১। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কিত সুসংবাদ ৪৫২
সুসমাচারটির তেতাল্লিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫২
চুয়াল্লিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৩
চুয়ান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৪
পঞ্চান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৫
ছিয়ানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৬
সাতানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৭
একশত ছত্রিশতম অধ্যায়ে মসিহের ভাষায় বলা হয়েছে : ৪৫৮
একশত বেয়াল্লিশতম অধ্যায়ে পুরোহিতগণ,
লেখকবৃন্দ ও ফরিশিদের ভাষায় বলা হয়েছে : ৪৫৯
যারা ঈসাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের থেকে দায়মুক্তি :
বায়ান্নতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৫৯
তিরানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৬০
চুরানব্বইতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে : ৪৬০
বিশ্বাসঘাতক যিহুদাকেই যিশুর পরিবর্তে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে : ৪৬১

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ-৪৬৩

তাওহিদের মতাদর্শ লালনকারী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সমূহ ৪৬৩
১. মার্কিয়নী বা মার্সিয়নী সম্প্রদায় (Marcionism) : ৪৬৩
২. বারবারানী সম্প্রদায় ৪৬৪
৩. ইলিয়ান সম্প্রদায় ৪৬৪

৪. ত্রিত্ববাদী সম্প্রদায় (Trinitarian) ৪৬৫
দ্বিতীয় মতাদর্শ : তাওহিদ ও একেশ্বরবাদ (Monotheism) ৪৬৫
১. ইবিয়ন সম্প্রদায় (Ebionites) ৪৬৫
২. শিমশাতি সম্প্রদায় ৪৬৫
৩. আরিসি সম্প্রদায় ৪৬৬
খ্রিষ্টানদের প্রসিদ্ধ উপদলসমূহ ৪৬৬
এক, ক্যাথলিক সম্প্রদায় ৪৬৬
এই দলের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা-বিশ্বাস ৪৭০
দুই, অর্থোডক্স সম্প্রদায় (Orthodox) ৪৭৩
অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের কিছু মূলনীতি ৪৭৩
তিন, বিরুদ্ধবাদী প্রোটেস্টান্ট ৪৭৩
প্রোটেস্টান্টদের মূলনীতিসমূহ ৪৭৫

ত্রিত্ববাদ ও তার অসারতা-৪৭৮

ত্রিত্ববাদের আকিদা (TRINITARIAN, DOCTRINE) ৪৭৮
খ্রিষ্টানদের মতে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা কী? ৪৮৩
আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ক্যাথলিকদের আকিদা ৪৮৬

আল্লাহ সম্পর্কে অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের আকিদা-৪৯০

প্রায়শ্চিত্যের আকিদা ও ত্রিত্ববাদে তার প্রভাব ৪৯৭

খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের মাঝে
তুলনামূলক পর্যালোচনা-৫০১

প্রথম অধ্যায়

ইহুদি জাতির ইতিহাস

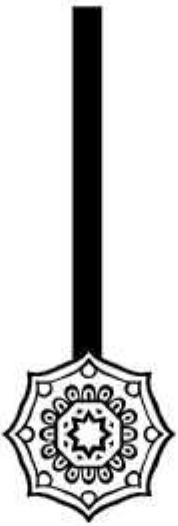

ইতিহাসের দর্পণে ইহুদি জাতি

প্রাচীনকাল থেকে ফিলিস্তিন এবং তার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলগুলোকে কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের দিক থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর ভূমি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই উর্বরতার কথা বিবেচনা করে ইংরেজরা এ অঞ্চলের নাম দিয়েছিল 'উর্বর বাঁকা চাঁদ' (fertile crescent)। ভূখণ্ডটির ভৌগোলিক প্রকৃতি ও গুরুত্বের কারণেই এই নামকরণ করা হয়। সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, জর্ডানের পশ্চিমাঞ্চল, ইরাক এবং নীলনদ সংলগ্ন কিছু অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল এই 'উর্বর বাঁকা চাঁদ'।

প্রাচীনকালে মরু-অঞ্চলগুলোতে শুষ্কতা বাড়তে থাকলে মানুষ ও জীবজন্তু স্থায়ী পানির উৎসের কাছাকাছি স্থানে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক তথ্যমতে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন আবাসপরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল আরব উপদ্বীপের কানানিদের (Canan) মাধ্যমে।

কানানিদের (Canan) আদি উৎস

কানানিরা মূলত নুহ আলাইহিস সালাম-এর পৌত্র কানান ইবনে হাম এর বংশধর। আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদেরকে তার দিকে সম্বন্ধ করে কানানি বলা হতো। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তারা হিজরত করে মধ্য ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে। তাদের নামেই এ অঞ্চলের নাম হয় কানান, যার কথা তাওরাতে বারংবার

এসেছে। প্রাচীন ফিলিস্তিন সভ্যতার গোড়াপত্তনে তাদের ভূমিকাই ছিল সর্বাগ্রে। দক্ষিণ ইরাকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় কানানিদের বসতিগুলোও ছিল ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো সর্বদা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত থাকত। ফলে তাদের একটা অংশ লেবানন পর্বতমালার পাদদেশে গিয়ে সংঘবদ্ধ নিবাস গড়তে বাধ্য হয়। পাহাড়ের পাদদেশে কাননিদের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর গোড়াপত্তন এভাবেই হয়েছিল। কানানিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন অঞ্চলে বসতি গড়া এই লোকগুলো গ্রিকদের ভাষায় ফিনিশিয় (Phoenicia) নামে পরিচিত।[১] যার অর্থ—লাল রক্তবর্ণের অধিকারী।

রোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এই ফিনিশিয়রা কানানিদের সাথে একীভূত ছিল। সমাজবিজ্ঞানী গুস্তাব লি বোন (Gustav Le Bon) মনে করেন, ফিলিস্তিন নামক একটি অসেমিটিক গোত্র গ্রিসের ক্রিট (Crete) দ্বীপ থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে রাজত্ব স্থাপন করে।[২]

খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপ থেকে দলে দলে মানুষ বিশেষ করে কানানিরা এ অঞ্চলে হিজরত করে। এই কানানিদের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলো জেবুসি (Jebusite)। এদের হাতেই প্রথম ঐতিহাসিক নগর আল-কুদস তথা জেরুজালেম (Jerusalem) এর গোড়াপত্তন হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ শহরের দুর্গগুলোতে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে গবেষণার পর এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, এই দুর্গগুলো খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ ইবরানিদের[৩] এ অঞ্চলে আক্রমণের আটশ বছর পূর্বে।

তাওরাতে বর্ণিত গোত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম গোত্র হলো আমালেকা। এরা একদম খাঁটি আরব জনগোষ্ঠী। ইবরানিদের (Hebrews) আগমনের পূর্বে এরা ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী এলাকা এবং দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করত। ইসরাইলি প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মত হলো এরা ইসহাক ও তার সহধর্মিণী রেবেকা এর পুত্র এষৌ (Esau) এর বংশধর। ইউশা[৪] ইবনে নুনের তিরোধানের পর ফিলিস্তিনে আগমনকারী বহিরাগত ইসরাইলিরা গাজা ও ইকরোন (Ekron) এর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়।[৫] কিন্তু তাদের

---

[১] *আল-আমল ওয়াল ইয়াহুদ ফিত-তারিখ*, পৃ. ১৯

[২] *আল-ইয়াহুদ ফি তারিখিল হাদারাতিল উলা*, পৃষ্ঠা : ২১

[৩] ইবরানি একটি ব্যাপক শব্দ। বনি ইসরাইল ও অন্যান্য অনেক জাতির জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো রূপক অর্থে শুধু ইসরাইলিদের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কিত আলোচনা সামনে আসবে। এখানে ইবরানি বলতে ইসরাইলিদেরকে বুঝানো হয়েছে।—অনুবাদক

[৪] ইসরাইলি গ্রন্থগুলোতে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যিহোশুয়। ইসলামি গ্রন্থগুলোতে ইনি ইউশা ইবনে নুন নামে পরিচিত। হাদিসেও তার নাম উল্লিখিত হয়েছে।—অনুবাদক

[৫] বিচারকগণের পুস্তক, অধ্যায় : ১, অনুচ্ছেদ : ১৮।

এই কর্তৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিচারকদের যুগের (The Era of Judges) শেষের দিকে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলিদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাবুত (Ark of the covenant) দখল করে নেয়। তখন থেকে নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের শাসনাধীনে ছিল। এ সময়ে স্যামসন (Samson) এর আগমন ঘটে এবং তিনি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্যামুয়েলের যুগে ইসরাইলিরা উপকূলীয় শহরগুলোতে প্রত্যাবর্তন করে, যেগুলো এতদিন ফিলিস্তিনিদের দখলে ছিল।

ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলিদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত এই যুদ্ধগুলোতে জয়-পরাজয়ের পাল্লা উঠানামা করত। কখনো ফিলিস্তিনিরা জয়ী হতো আবার কখনো ইসরাইলিরা। একপর্যায়ে বাদশাহ শৌল (Saul)-এর পর আল্লাহর নবি দাউদ আলাইহিস সালাম শাসন ক্ষমতায় আসেন এবং ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে তাবুত (Ark of the covenant) [৬] উদ্ধার করেন। [৭]

প্রাচীন অ্যাসেরিয়ান (Assyrian) ও মিশরীয় লিপিতে ফিলিস্তিনিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ লিপিগুলোতে তাদের নাম উৎকীর্ণ হয়েছে (Palastu) কিংবা (Pilistu) নামে। ইউনানি পরিভাষায় যেটা Philistia নামে পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এ সম্পর্কিত যথেষ্ট তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন। আমুন (Amun) দেবতা-র উপাসনাগৃহের দেয়ালে তৃতীয় র‍্যামেসিস (Third Ramesses) কর্তৃক খোদাইকৃত এ সংক্রান্ত বহু তথ্য-উপাত্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। [৮]

ফুরাত (Eufrates) নদীর অববাহিকা থেকে উঠে আসা আরামীয়দের (Arameaus) কয়েকটি গোত্র জর্ডান নদীর উত্তর-পূর্বে বসবাস করতো। তন্মধ্যে উত্তরাংশে আম্মুন (Ammon), মধ্যবর্তী এলাকায় মোয়াবি (Moabite) এবং দক্ষিণাংশে ইদম (Edom) সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old testament) এর আদি-পুস্তক (Book of Genesis) এর দশম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদে এদেরকে আরাম ইবনে সাম ইবনে নুহ এর বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ তথ্যমতে কুরআনে বর্ণিত ইরাম (إرم) শব্দটি মূলত এদের নাম থেকেই

---

[৬] বনি ইসরাইলের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী একটি পবিত্র সিন্দুক। সিনাই পর্বতের পাদদেশে অবস্থানকালীন সময়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এটি নির্মাণ করা হয়। এরপর এতে দশ আজ্ঞা বিশিষ্ট ফলকদ্বয়, মান্না-সালওয়া ভরতি একটি পাত্র এবং মুসা আ. এর লাঠি সংরক্ষণ করা হয়। ইসরাইলিরা যেখানেই যেত এই সিন্দুকটি বহন করে নিয়ে যেত। ইবাদতগৃহের সবচেয়ে পবিত্র স্থানে তারা এটিকে স্থাপন করত। পরবর্তীতে সুলাইমান আ. এর যুগে এটি খোলা হয়। কিন্তু ভেতরে ফলকদ্বয় ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায়নি।—অনুবাদক

[৭] এখানে তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী তথ্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও ইসলামি গ্রন্থগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী বাদশাহর নাম ছিল তালুত। তার সময়েই ইসরাইলিরা তাদের লুণ্ঠিত তাবুত ফিরে পায়। দাউদ আ. ছিলেন তালুতের বাহিনীর একজন সদস্য। তালুতের পর তিনি বাদশাহ হন।—অনুবাদক

[৮] *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, পৃষ্ঠা : ১০৫

উৎকলিত। এই গোত্রগুলো খুব স্বল্প সময়ে যাযাবর জীবন থেকে শহুরে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তাদের বর্তমান অবস্থানস্থলের উর্বরতা এই পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই ছিল প্রাচীন ফিলিস্তিন ও প্রতিবেশী গোত্রগুলোর বিবরণ।[৯]

হাইকলে সুলাইমানি ও মসজিদে আকসা

১৯৬৭ সাল থেকে ইসরাইল জেরুজালেম ও এর আশেপাশে সুড়ঙ্গসহ নানা ধরনের খননকার্য শুরু করে। বিশেষ করে কুব্বাতুস সাখরা (Dome of The Rock) এবং মসজিদে আকসার নিচে তারা তাদের কল্পিত হাইকেলে সুলাইমানির[১০] অনুসন্ধান করতে থাকে। কিন্তু তাদেরকে নিরাশ হতে হয়। কল্পিত হাইকেলে সুলাইমানির অস্তিত্ব পাওয়া তো দূরের কথা, উল্টো সেখানে এমন কিছু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো এই শহর আরব্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে এবং ইবরানিদের সাথে এই শহরের সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। ব্যাবিলনীয় এবং ইরানিদের আক্রমণের পর সেখানে ইসরাইলিদের কোনো ধরনের চিহ্ন আর অবশিষ্ট ছিল না। বিশেষ করে সম্রাট টাইটাস (Titus) আক্রমণের পর তার কোনো এক দেবতার নামে সেখানে বিশাল এক উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। এমনকি জেরুজালেম নাম পাল্টে দিয়ে ইলিয়া নামকরণ করেন।

---

[৯] এ সম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি কর্তৃক রচিত তারিখু আরদিল কুরআন, ড. আহমাদ সওসা রচিত *আল-আরব ওয়াল ইয়াহুদ ফিত তারিখ*, গুস্তাব লী বোন কর্তৃক রচিত *তারিখুল হাদারাতিল উলা* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে।

[১০] ইহুদিদের বিশ্বাস মতে দাউদ আ. একটি ইবাদতগৃহ নির্মাণের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তার সেই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এরপর তার পুত্র সুলাইমান আ. সেটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এটিই ইহুদিদের কাছে হাইকলে সুলাইমান (Solomon's Temple) নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে ইহুদিদের কাছে এই হাইকলের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুলাইমান আ. এর ইন্তেকালের পর ইহুদিরা অভ্যন্তরীণ কলহে জড়িয়ে পড়ে। এরপর ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বহিঃশক্তির আগ্রাসনের শিকার হয়। এসব অভিযানে হাইকলও বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমনকি একাধিকবার সেটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাঙা-গড়ার এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। সর্বশেষ ১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট হেরোত ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দেন। এরপর তারা আর কখনোই একত্র হতে পারেনি। ফলে হাইকলের পুনর্নির্মাণ করতে পারেনি।

এই হলো হাইকল সম্পর্কে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের এই হাইকল কাহিনির নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ তারা এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। সুলাইমান আ. কর্তৃক আদৌ এমন কিছু নির্মাণের বিবরণ সুপ্রমাণিত নয়।

১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের বাসেল নগরীতে থিওডর হারজেলের সভাপতিত্বে জায়নবাদীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারা দাবি করে—বর্তমান মসজিদে আকসার স্থলেই ছিল তাদের হাইকলে সুলাইমান। সুতরাং তাদের দাবিমতে মসজিদে আকসাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তদস্থলে তাদের হাইকলের পুনর্নির্মাণ করতে হবে। দাবি করলেও দাবির স্বপক্ষে তারা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। এমনকি মসজিদে আকসার নিচে ব্যাপক খোঁড়াখুঁড়ি করেও হাইকলের অস্তিত্ব প্রমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো নিদর্শনও তারা পেশ করতে পারেনি। হাইকলের গল্প যেন আজও রূপকথারই গল্প।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদে আকসার নির্মাণ সম্পর্কে *সহিহুল বুখারি*তে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম—

أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلاً؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ «الْمَسْجِدُ الأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً»[১১].

পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, "মসজিদে হারাম।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, "মসজিদে আকসা।" আমি বললাম উভয় মসজিদের নির্মাণের মাঝে কতদিন ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন "চল্লিশ বছর।"[১১]

ইমাম আযরাকিসহ আরও অনেকেই মসজিদে হারাম নির্মাণসংক্রান্ত বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। এসব রেওয়ায়াতের সারমর্ম হলো, মসজিদে হারামের প্রথম নির্মাতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম। সুতরাং এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক মসজিদে হারাম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর তারই কোনো পুত্র মসজিদে আকসার ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রশ্ন আসতে পারে—তাহলে কাবাঘরের নির্মাতা হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নাম সবার আগে আসে কেন? সে ক্ষেত্রে আমরা বলব, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মসজিদে হারামের প্রথম নির্মাতা নন। বরং তিনি হলেন পুনর্নির্মাতা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

যখন আমি ইবরাহিমকে বাইতুল্লাহর স্থান নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাজে দণ্ডায়মানদের জন্য এবং রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। [সুরা হজ, আয়াত : ২৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১১] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ৪০৭

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাঘরের ভিত তুলছিলেন। তারা দুআ করলেন, হে আমাদের রব, আমাদেরকে কবুল করুন। নিশ্চই আপনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৭]

এই দুটি আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যে স্থানে কাবা নির্মাণ করেছেন সেটি পূর্ব থেকে বাইতুল্লাহর জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল।

আল্লামা ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসিরগ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহর আগের ভিতের ওপরই তার নির্মাণকাজ করেছিলেন।

এ ছাড়া বাইতুল্লাহর পূর্ব অস্তিত্বের বিষয়টি কুরআনে বর্ণিত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সেই বিখ্যাত দুআ থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ .

হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার পরিবারের কতেককে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে তরুলতাহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭]

এই দুআটি তিনি করেছিলেন প্রথমবারের মতো শিশুপুত্র ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে আল্লাহর নির্দেশে এই মরুপ্রান্তরে রেখে যাওয়ার সময়। আর তিনি বাইতুল্লাহর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছিলেন পরবর্তী সফরে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্মাণের পূর্বেই বাইতুল্লাহর নির্মাণ সংঘটিত হয়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ .

নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই ঘর যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৯৬]

আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবিরই ইবাদতগৃহ ছিল। বাইতুল্লাহই যেহেতু প্রথম নির্মিত ঘর তাই নিঃসন্দেহে এটি অন্যান্য নবিদের ইবাদতগৃহ নির্মাণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। আর হাদিসের ভাষ্যমতে বাইতুল্লাহর প্রথম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর মসজিদে আকসা প্রথমবারের মতো নির্মিত হয়েছিল। আর সেটা আদম আলাইহিস সালামের সময়কালে হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। দাউদ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মসজিদে আকসার যে নির্মাণের কথা বলা হয় সেটাও ছিল পুনর্নির্মাণ। প্রথম নির্মাণ অন্য কারও হাতে সম্পাদিত হয়। অতঃপর, কালের আবর্তনে মাটিতে মিশে গিয়ে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে যায়। এরপর সে ভূমিতে নতুন করে জনবসতি গড়ে উঠে। তাদের কাছ থেকে স্থানটি ক্রয় করে দাউদ আলাইহিস সালাম মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করেন। আর তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানে নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। অতঃপর আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবি হিসেবে সকল নবির ওয়ারিশ। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসাতে তাকে রাত্রিকালীন সফর করানো হয়েছে। সুতরাং, তাঁর অবর্তমানে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উম্মতই উত্তরাধিকারসূত্রে এই মসজিদে আকসার মালিক হওয়ার অধিক উপযুক্ত। 'মসজিদে আকসা' এর শাব্দিক অর্থ হলো দূরপ্রান্তের মসজিদ। এটি কুরআন-প্রদত্ত নাম। ইসরাইলি গ্রন্থগুলোতে এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা মসজিদে নববির তুলনায় দূরে বিধায় এ নামকরণ করা হয়েছে। নবিজির ইসরা যখন সংঘটিত হয় তখনো মসজিদে নববি নির্মাণ হয়নি। এতৎসত্ত্বেও এ নামকরণের পেছনে এই ইঙ্গিত ছিল যে অচিরেই আরেকটি পবিত্র মসজিদ নির্মিত হবে যা মসজিদে আকসার তুলনায় মসজিদে হারামের নিকটবর্তী।

মোদ্দাকথা, উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে মসজিদে আকসা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোর ওপর মুসলমানদের অধিকারের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। মসজিদে আকসা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

> পরম পবিত্র ও মহিমাময় সেই সত্তা যিনি তার বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১]

বিশুদ্ধ হাদিসে যে তিনটি মসজিদকে উদ্দেশ্য করে সফরের বৈধতা দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো মসজিদে আকসা। মসজিদে আকসার বর্তমান কাঠামো নির্মাণের

কৃতিত্বও মুসলিম খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের। ৬৬ হিজরিতে তার নির্দেশে কুব্বাতুসসাখরা ও মসজিদে আকসার বর্তমান ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। শুভকর্মটি সুসম্পন্ন হয় ৭৩ হিজরিতে।

ওপরের পুরো আলোচনা থেকে জেরুজালেম নগরের আরব্য হওয়া এবং মসজিদে আকসায় মুসলিমদের অধিকারের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। হাইকলে সুলাইমানির ওপর মসজিদে আকসা নির্মাণের যে মিথ্যা দাবি ইহুদিরা করে থাকে শত খোঁড়াখুঁড়ির পরও তারা সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি।

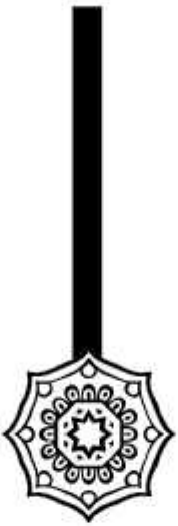

খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

নবিগণের পিতা খলিলুল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম 'উলুল আযম' তথা দৃঢ়চেতা রাসুলগণের অন্যতম। কুরআনুল কারিমের বহু জায়গায় তার আলোচনা স্থান পেয়েছে। তার দাওয়াতের পদ্ধতি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণতা, কাবাঘর বিনির্মাণ প্রভৃতি মহান মহান অবদানের সবিশদ আলোচনা কুরআনের বিভিন্ন সুরায় আলোচিত হয়েছে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে *আদিপুস্তক*কে (Book of Geneses) ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জীবনীর জন্য সবচেয়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উৎসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম উর (Ur) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১২]

উর হলো ব্যাবিলন (Babylon) এর দক্ষিণে দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি ক্যালডিয়ান (Chaldean) নগরীর নাম, যা বর্তমানে ইরাক নামে পরিচিত। এ নগরীটির গোড়াপত্তন হয় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার সালে। প্রথমে সুমেরিয়রা (Sumerian)

---

[১২] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১১, অনুচ্ছেদ : ২৮। তাঁর জন্ম-সংক্রান্ত এটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা। অনেকের মতে তিনি উরুক (Uruk) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো বর্ণনামতে তার জন্মস্থান হলো কুথা (Kutha)। সেখানেই তিনি জালিম শাসক কর্তৃক আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কুথা নগরীর টিলাগুলো এখনো ইবরাহিমি টিলা (Tell Ibrahim) নামে পরিচিত। এর পাদদেশে মাকামে ইবরাহিম নামক একটি দর্শনীয় স্থানও রয়েছে।

এখানে বসবাস করে। এদের পর আসে ইলামিতরা (Elamite)। এরপর পর্যায়ক্রমে ব্যাবিলনিয়নরা ও সর্বশেষ ক্যালডিয়ানরা এখানে বসতি স্থাপন করে।[১৩]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে নুহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ:

ইবরাহিম ইবনে নাহোর ইবনে সরুগ ইবনে রিয়ু ইবনে পেলগ ইবনে এবর ইবনে শেলহ ইবনে অর্ফকশদ ইবনে শেম ইবনে নুহ। নুহ আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো ৯৯২ বছর।

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জাতি ছিল পৌত্তলিক। তারা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা করত। নুনার (Nunar) নামক তাদের এক চন্দ্রদেবতা ছিল। এমনকি তারা এটাও বিশ্বাস করত যে, এই দেবতার নিনহাল নামক একজন স্ত্রীও আছেন। পরিণত বয়সে পৌঁছার পর আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নবি হিসেবে মনোনীত করলেন। নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি নিজ জাতিকে তাওহিদের দাওয়াত ও মূর্তিপূজার নিন্দা করতে শুরু করলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .
>
> স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন ইবরাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিগুলোকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করছেন? আমি আপনাকে এবং আপনার জাতিকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। [সুরা আনআম, আয়াত : ৭৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

> وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ .
>
> আর আমি ইতিপূর্বে ইবরাহিমকে শিক্ষা দান করেছি। আর তার সম্পর্কে আমি অবগত যখন তিনি তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই প্রতিমাগুলো কী যেগুলোর তোমরা পূজা করছ? [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৫১-৫২]

---

[১৩] আল-ইয়াহুদ, পৃষ্ঠা : ৩

ব্যবিলনের বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। নিজেকে উপাস্য দাবি করতেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের তাওহিদ প্রচারের কথা জানতে পেরে বাদশাহ তাকে বিতর্কের জন্য ডেকে পাঠান। কুরআনে এই বিতর্কের ঘটনাটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

সে লোকের কথা কি তোমার জানা নেই, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহিমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজত্ব দান করেছিলেন? ইবরাহিম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহিম বললেন, নিশ্চয় তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করো। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৮]

এ ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। স্বীয় জাতি কর্তৃক তিনি আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন—

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ .

আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইবরাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৯]

আত্মীয়স্বজনের সাথে উরে অবস্থান করা যখন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাররান (Harran) নগরীতে হিজরত করেন। এটি ছিল ফুরাতের একটি শাখানদীর তীরে অবস্থিত আরামীয়দের একটি শহর। এর ভৌগোলিক অবস্থান হলো, পশ্চিমে লেবানন পর্বতমালা থেকে নিয়ে ফুরাতের তীর পর্যন্ত, উত্তরে তারোস পর্বতমালা (Taurus Mountains) থেকে নিয়ে দক্ষিণে দামেস্ক পর্যন্ত। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হাররানে হিজরত করলেও সেখানে বেশিদিন অবস্থান করতে

পারেননি। কেননা, হাররানের অধিবাসীরাও ছিল পৌত্তলিক। ফলে তারাও তার সাথে শত্রুতা শুরু করে এবং নানাভাবে তাকে উৎপীড়ন করতে থাকে। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারা, ভ্রাতুষ্পুত্র লুত, নিজের গোলাম এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো নিয়ে কানানের উদ্দেশ্যে হাররান ত্যাগ করেন।

আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র লুতকে দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য হাররানে রেখে গিয়েছিলেন। কারণ, হাররানের নগরপ্রধান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার অনুরোধের প্রেক্ষিতেই লুত আলাইহিস সালাম সেখানে থেকে যান। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী সারাকে নিয়ে কানান অভিমুখে চলে যান এবং শিকম নগরীতে (Shikm city) অবস্থান করেন। এ নগরীটি বর্তমানে নাবলুস (Nablus) নামে পরিচিত। তিনি কানানের নানা শহরে ঘুরে ঘুরে মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। ইত্যবসরে ওই এলাকায় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। জমি শুকিয়ে ফসল উৎপাদনও থেমে যায়।[১৪] ফলে কানানের অধিকাংশ অধিবাসী হিজরত করতে বাধ্য হয়। এ সময় অনেক কানানি পরিবারের মতো ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও স্বপরিবারে মিশরে হিজরত করেন। সে সময়ে মিশর শাসন করত হেক্সোসরা (Hyksos)। তাদের বাদশাহ ছিল অত্যন্ত প্রতাপশালী ও অত্যাচারী। বিবাহিত রমণীদেরকে সে জোরপূর্বক ভোগ করত। তাই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার সামনে স্ত্রী সারাকে নিজের বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন।[১৫]

বুখারি ও *মুসলিম* শরিফে আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু এর সূত্রে এ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন, 'ইবরাহিম (আ.) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি। তন্মধ্যে দুবার ছিল আল্লাহর ব্যাপারে। তার উক্তি "আমি অসুস্থ" [আস্‌সাফফাত, আয়াত : ৮৯] এবং তাঁর অন্য এক উক্তি "বরং এ কাজ করেছে, এই তো তাদের বড়টি" [সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৬৩]। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম) এবং সারা এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় এসে পৌঁছালেন। তখন তাকে খবর দেওয়া হলো, এ এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সঙ্গে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা আছে। তখন বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠাল। সে জিজ্ঞেস করল, এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মহিলাটি আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার নিকট এসে বললেন, হে সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর ওপর আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি

[১৪] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ১০।
[১৫] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১২, অনুচ্ছেদ : ১৩।

আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। অতঃপর বাদশাহ সারাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তিনি যখন তার নিকট প্রবেশ করলেন এবং রাজা তার দিকে হাত বাড়াল তখনই তার হাত অবশ হয়ে গেল। সে মুহূর্তে অত্যাচারী রাজা সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করো, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। তখন সারা আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে ধরতে চাইল। এবারও তার হাত পূর্বের মতো বা তার চেয়েও কঠিনভাবে অবশ হলো। এবারও সে বলল, আল্লাহর নিকট আমার জন্য দুআ করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দুআ করলেন, ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার এক দারোয়ানকে ডেকে বলল, তুমি তো আমার নিকট কোনো মানুষ আনোনি। বরং এনেছ এক শয়তান। অতঃপর রাজা সারার খিদমতের জন্য হাজেরাকে দান করল। সারা যখন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নিকট এলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে সারাকে বললেন, কি ঘটেছে? তখন সারা বললেন, আল্লাহ কাফির বা ফাসিকের চক্রান্ত তারই বুকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আর সে হাজেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।' আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হে আরব জাতি! হাজেরাই হলেন তোমাদের আদি মাতা।[১৬]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সারাকে বোন পরিচয় দিয়েছিলেন সম্ভবত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কেননা তখন পর্যন্ত লুত এবং সারা ব্যতীত আর কোনো ঈমানদার ছিল না। অথবা সারা ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামের চাচাতো বোন। সেদিক থেকে বোন পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, "এই তিনটি বাক্যকে মিথ্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে শ্রোতার বিশ্বাস বিবেচনায়। নতুবা এগুলোর একটিও নিরেট কোনো মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলো এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্য যার উভয় দিক সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"[১৭]

এর পর ঘটনা পাল্টে যায় সম্পূর্ণ উল্টো দিকে—বাদশাহ সারার উচ্চ মর্যাদায় প্রভাবিত হয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সম্মান করেন এবং সারার সেবিকা হিসেবে হাজেরাকে উপহার দেয়। সারা হাজেরাকে নিজের জন্য না রেখে স্বামীর জন্য দিয়ে দেন।

---

[১৬] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৮, হাদিস নং : ৩৩৫৮

[১৭] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯১

তাঁর সাথে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহবাস হয় এবং সেখান থেকে আরব জাতির পিতা ইসমাইল আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্মের চৌদ্দ বছর পর সারার গর্ভে ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। আর তিনিই হলেন বনি ইসরাইলের পূর্বপুরুষ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের আগ পর্যন্ত এ বংশেই নবুওয়তের ধারা অব্যহত ছিল। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশের প্রথম এবং সর্বকালের জন্য শেষ নবি।

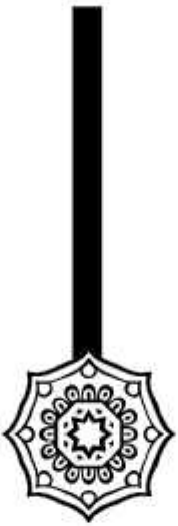

ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গ

হাজেরার গর্ভে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। ইসমাইল ইবরানি (Hebrew) শব্দ। এর অর্থ হলো (يسمع الله) আল্লাহ্ শোনেন, সাড়া দেন। যেহেতু ৮৬ বছর বয়সে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তাআলার কাছে সন্তান কামনা করে দুআ করেছিলেন এবং সেই দুআয় সাড়া দিয়ে আল্লাহ্ তাআলা ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন তাই এ নামে নামকরণ করা হয়।[১৮] ইসমাইল আলাইহিস সালাম হলেন সেমেটিকদের আদিপিতা। তার মাধ্যমে একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল।

বাইবেলের *আদিপুস্তকে* বর্ণিত হয়েছে, 'আর ইশমায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখো আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।'[১৯] তার বংশের সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ :

---

[১৮] আদিপুস্তক, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১৬।

[১৯] আদিপুস্তক, অধ্যায় : ১৭, অনুচ্ছেদ : ২০। ইসমাইল আ. এর বার পুত্রের নাম : ১। নবায়োৎ, ২। কেদর, ৩। অদবেল, ৪। মিবসম, ৫। মিশম, ৬। দুমা, ৭। মসা, ৮। হদদ, ৯। তেমা, ১০। যিটূর, ১১। নাফীশ, ১২। কেদমা।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর[২০] ইবনে মালেক ইবনে নজর ইবনে কানানা ইবনে খোজাইমা ইবনে মুদরাকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুজার ইবনে নিজার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান।

বংশবিশারদ, ফুকাহা ও মুহাদ্দিসিনগণ নবিজির বংশ পরম্পরার এ পর্যন্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একমত। আর এ বর্ণনাটি ইমাম বুখারি তার সহিহ গ্রন্থে '*মানাকিবুল আনসার*' এর 'মাবআছুন নবি' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনে সাদ তার *তাবাকাত* গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যেখানে বলা হচ্ছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদ ইবনে আদনানের পর আর বংশলতিকা বর্ণনা করতেন না। এতৎসত্ত্বেও বংশবিশারদগণ এ বিষয়ে একমত যে, আদনানের বংশ পরম্পরা ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং তিনি হলেন নবিজির আদিপিতা।

সহিহ মুসলিম গ্রন্থে এসেছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের বংশ থেকে কিনানাকে বাছাই করেছেন। কিনানার বংশধর থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশকে। এরপর কুরাইশদের থেকে নির্বাচন করেছেন বনু হাশেমকে। আর বনু হাশেম থেকে চয়ন করেছেন আমাকে।[২১]

আদনান ও ইসমাইলের মধ্যবর্তী প্রজন্মসংখ্যা নিয়ে বংশবিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তথাপি মুসতাদরাকে হাকেম এবং আল্লামা তাবারানির *আল-মুজামুল কাবির* গ্রন্থে বর্ণিত উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আদনানের বংশপরম্পরা হলো, আদনান ইবনে উদ্দ ইবনে বাররি ইবনে আরাকুস সারা। সর্বশেষ বর্ণিত এই আরাকুস সারা হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম। ইবনে হাজার আসকালানি *ফাতহুল বারিতে*

---

[২০] তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ। এখান থেকে কুরাইশ বংশের প্রচলন।—অনুবাদক

[২১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৪৩৪১।

দশের অধিক মত বর্ণনা করার পর বলেন, 'সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো তাবারানি ও হাকেম যেটা উল্লেখ করেছেন।'[২২]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশে একজন রাসুল প্রেরণ করার জন্য। কুরআনে তার সেই দুআটি বর্ণিত হয়েছে—

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

> হে প্রভু! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১২৯]

ইসমাইলের মাতা হাজেরা স্বাধীন রমণী ছিলেন নাকি দাসী ছিলেন এ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী হাজেরা দাসী ছিলেন। সারা এর খিদমতের জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল। যেমন *আদিপুস্তকে* বলা হচ্ছে, "আব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিসরীয়া দাসী ছিল। তাহাতে সারী অব্রামকে কহিলেন, দেখ, সদাপ্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর; কি জানি, ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব।"[২৩]

তাওরাতের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার ডেভ শেলুম (D. Shalum) বলেন, 'হাজেরা ছিল ফিরাউন-কন্যা। সারার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শন করে সে নিজ কন্যাকে তার খিদমতে প্রেরণ করে। স্বীয় কন্যা একজন মর্যাদাবান রমণীর সেবা করাটাকে সে পছন্দ করেছিল।'[২৪]

সহিহুল বুখারিতে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের শেষে এসেছে, "আর সে হাজেরাকে খিদমতের জন্য দান করেছে।" আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আসমানের পানির সন্তানেরা ! হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা।[২৫] এখান থেকে বুঝা যায় সারা এর খেদমতের জন্যই হাজেরাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনামতে হাজেরার পিতা ছিলেন একজন কিবতি সম্রাট। হাফন নামক একটি মিশরীয় গ্রামে তিনি বসবাস করতেন। একজন ভারতীয়

[২২] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৩৩।
[২৩] *আদিপুস্তক*, অধ্যায় : ১৬, অনুচ্ছেদ : ১-২।
[২৪] *তারিখু আদিয়াল কুরআন*, পৃষ্ঠা : ২৮৩।
[২৫] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুল আম্বিয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮৮, হাদিস নং : ৩৩৫৭।

আলেম *আন-নুসুসুল বাহিরাহ ফি হুরিয়্যাতিল হাজেরা* নামক একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে আসমানেরর পানির সন্তান বলে সম্বোধন করার কারণ হলো, আরবরা যেসব এলাকায় কিছু বৃষ্টিপাত হয় চতুষ্পদ জন্তু চরানোর সুবিধার্থে সেসব এলাকায় বসবাস করত। আবার অনেকে মনে করেন আসমানি পানি বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে জমজম। কেননা আল্লাহ তাআলা হাজেরার জন্য এটি উৎসারিত করেছেন। তার সন্তানও এর ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেছে। সেদিক থেকে তারা এই পানির সন্তানের মতোই। ইবনে হিব্বান বলেন, ইসমাইলের উত্তরসূরিদের আসমানি পানির সন্তান বলা হয়। কেননা ইসমাইল হলেন হাজেরার সন্তান, যাকে হাজেরা জমজমের পানি দিয়ে লালনপালন করেছেন। জমজম হলো আসমানি পানি।[২৬]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর হিজরতের সময় মিশরের অধিবাসী হেক্সোসদের পরিচয়

মিশরীয় রাজবংশের গোড়াপত্তনের পর ত্রয়োদশ প্রজন্ম অতিবাহিত হতে না হতেই মিশরে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসময় মিশরের কর্তৃত্বে আসে আরব সেমেটিকরা। এরাই মূলত হেক্সোস (Hyksos) নামে পরিচিত। আরব ইতিহাসবিদরা অবশ্য এদের নাম দিয়েছিলেন আমালেকা। এটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ঘটনা। এদের আদি নিবাস সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে এরা ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং জাযিরাতুল আরব এর বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আরব গোত্র। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময়ে তারা মিশরে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, একদিক থেকে মিটানি (Mitanni) শাসকদের জুলুম অপরদিকে আরামীয়দের এ অঞ্চলে ব্যাপকহারে হিজরত এই দ্বিমুখী চাপে বাধ্য হয়ে তারা সিরিয়া অঞ্চল থেকে নতুন আবাসস্থলের খোঁজে মিশর এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মান ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড ম্যুরও এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মতে মিশরে হেক্সোসদের আগমন ঘটেছিল খ্রিষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যখন আরামিয়রা তাদের ওপর ঝেঁকে বসছিল তখন থেকেই মূলত বাধ্য হয়ে তারা মিশরে হামলা চালায়।[২৭]

ইহুদি ও খ্রিষ্টান আলেমদের মতে ইউসুফ আলাইহিস সালাম খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আর তার কারাবরণের ঘটনা ঘটে ১৮৯০ খ্রিষ্টপূর্বে। এখান থেকে বুঝা যায় হেক্সোসরা কমপক্ষে খ্রিষ্টপূর্ব বিংশ শতাব্দীতে মিসরে এসেছিল। মিশরে বসবাস শুরু

[২৬] *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৪।
[২৭] *মাওয়াকিফুশ শামস, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯৮।*

করলেও তারা জাতিগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মিশরীয়দের সাথে মিশে যায়নি। বরং সর্বক্ষেত্রে তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছিল। উভয় জাতির দেবতাদের মধ্যেও ছিল ভিন্নতা। হিজরতের সময় এসব উপাস্যগুলোকে তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল। তাই দেখা যায় পবিত্র কুরআন মিশরীয় শাসকদের ক্ষেত্রে ফিরাউন শব্দটি ব্যবহার করলেও হেক্সোস সম্রাটদের ক্ষেত্রে এ নাম ব্যবহার করেনি। তাদেরকে কুরআন মালিক বা বাদশাহ হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন সুরা ইউসুফে এসেছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى...

বাদশাহ বলল, নিশ্চয় আমি দেখেছি...। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৪৩]

আরেক আয়াতে এসেছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ...

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো...। [১ সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৫০]

অন্য আয়াতে উল্লেখ হয়েছে—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي...

বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার ঘনিষ্ঠজন বানিয়ে নেব। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৫৪]

হেক্সোস সম্রাট ও মিশরীয় সম্রাটদের মধ্যে এই পার্থক্যকরণের কারণ হলো, সম্রাটদের ফিরাউন অভিধায় ভূষিত করা মিশরীয়দের একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ। আর যেহেতু উভয় জাতির ধর্ম ভিন্ন তাই হেক্সোস সম্রাটদের ক্ষেত্রে মিশরীয় সম্রাটদের এই ধর্মীয় উপাধিটি ব্যবহার করা হয় হয়নি। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি কথিত তাওরাত সংকলকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাই দেখা যায়, কুরআন উভয় জাতির সম্রাটদের উপাধিতে ভিন্নতা অবলম্বন করলেও তাওরাতে সেটা করা হয়নি। ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাওরাতে হেক্সোস সম্রাটদের জন্য ফিরাউন উপাধিটি ব্যবহার করেছে। শুধু একবারই দেখা গেছে মালিক বা বাদশাহ শব্দটি ব্যবহার বনি ইসরাইলের ঘটনার বর্ণনার শুরুতে।

এখান থেকে কুরআন আল্লাহকর্তৃক অবতীর্ণ ও অলৌকিক হওয়ার দিকটিও চমৎকারভাবে ফুটে উঠে। কুরআন যদি মানবরচিত হতো তাহলে সেখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থ

বাইবেলের অনুকরণে হেক্সোস সম্রাটদের জন্যও ফিরাউন শব্দটি ব্যবহার করত। কেননা সেই সময় প্রাচীন ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলতেই ছিল এ বাইবেলই।[২৮]

আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, হেক্সোসদের কমপক্ষে তিন শতাব্দী পরে মিশরে ফিরাউনদের রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিরাউনদের যুগেই।

জবিহুল্লাহ হলেন ইসমাইল আলাইহিস সালাম

ইহুদিদের কূটচালের আরেক ঘুটি হলো—তারা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক পুত্র সন্তানকে জবেহ করার ঘটনাতেও বিকৃতি সাধন করে সেটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের স্থলে জবিহুল্লাহ হিসেবে ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম প্রচার করে। এখানে আমরা *আদিপুস্তক* থেকে এ ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছি।

এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম; তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও, এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। পরে অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া গর্দভ সাজাইয়া দুই জন দাস ও আপন পুত্র ইসহাককে সঙ্গে লইলেন, হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ কাটিলেন, আর উঠিয়া ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখিলেন। তখন অব্রাহাম আপন দাসদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে গর্দভের সহিত থাক; আমি ও যুবক, আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। তখন অব্রাহাম হোমের কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইসহাকের স্কন্ধে দিলেন, এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়্গ লইলেন; পরে উভয়ে একত্রে চলিয়া গেলেন। আর ইসহাক আপন পিতা অব্রাহামকে কহিলেন, হে আমার পিতা, তিনি কহিলেন, হে বৎস, দেখ, এই আমি। তখন তিনি কহিলেন, এই দেখুন, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে মেষশাবক কোথায়? অব্রাহাম কহিলেন, বৎস, ঈশ্বর আপনি হোমের জন্য মেষশাবক যোগাইবেন। পরে উভয়ে এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে অব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইলেন, পরে আপন পুত্র ইসহাককে বাঁধিয়া বেদিতে কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন। পরে অব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। এমন

---

[২৮] *আল-কুরআন ওয়াল ইলমুল আসরি, (কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান, মরিস বুকাইলি)* পৃষ্ঠা : ৭৫—নিরীক্ষক।